রাবুবিয়াত দর্শন : একটি সমীক্ষা

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী

অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

গবেষক

এ. বি. এম. মুস্তাফিজুর রহমান

এম. ফিল. গবেষক

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষার রোল নং-০৫

নিবন্ধন নং-৪৮৭/২০০৪-২০০৫

শিক্ষাবর্ষ ২০০৪/২০০৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"রাবুবিয়াত দর্শন : একটি সমীক্ষা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক **ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী,** অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ অথবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করিনি।

২৬/৮/২০২১

এ.বি.এম. মুস্তাফিজুর রহমান
এম.ফিল. গবেষক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এ.বি.এম. মুস্তাফিজুর রহমান, এম.ফিল, গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম.ফিল, ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে উপস্থাপিত "রাবুরিয়াত দর্শন ঃ একটি সমীক্ষা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছে। আমি এর পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি। আমার জানামতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা লাভের জন্য অথবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং, গবেষককে এম.ফিল, ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

২৭/৮/২০২১

(ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী)
অধ্যাপক,
দর্শন বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবাণীতে অবশেষে "রাবুবিয়াত দর্শন : একটি সমীক্ষা" শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করলাম। যথা সময়ে বিধি মুতাবিক অভিসন্দর্ভটি লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান রাব্বুল আলামীনের শানে শুকরিয়া আদায় করছি এবং মানবতার মহান শিক্ষক নবী কারীম (স.) এর পাক শানে দরূদ ও সালাম পেশ করছি। যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ **ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রতি**। কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণা কর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তন উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার ফলেই অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে। আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায় উপধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সহযোগিতায়। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আমার বিভাগের অন্যসব শিক্ষকদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. হারুন রশীদ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি বিভিন্ন সময়ে আমাকে উৎসাহ, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেছেন। পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে যার কথা উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন, মোঃ জামাল হোসেন, পি.এইচ.ডি. গবেষক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বিভিন্ন সময়ে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে এবং সার্বিকভাবে মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে অভিসন্দর্ভটি যথা সময়ে মানসম্পন্নভাবে শেষ করতে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। বিশেষ করে এ মুহূর্তে যাকে আমি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, তিনি হলেন আমার **শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ-অধ্যক্ষ আবদুল মালেক আখন্দ্, মৌকরণ বি. এল. পি ডিগ্রী কলেজ, পটুয়াখালী-কে**। তিনি শুরু থেকেই আমাকে নিরন্তন উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, বিভিন্ন রকম পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে আমার এম. ফিল. কার্যক্রম সুসম্পন্ন করার ব্যাপারে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর এ সহযোগিতা ছাড়া এ গবেষণা কার্যক্রম সুসম্পন্ন করা কোনভাবেই সম্ভব হত না।

Dhaka University Institutional Repository

সুসম্পন্ন করার ব্যাপারে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর এ সহযোগিতা ছাড়া এ গবেষণা কার্যক্রম সুসম্পন্ন করা কোনভাবেই সম্ভব হত না।

এ সময়ে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাচ্ছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতাকে। বিশেষ করে আমার পিতা **স্বনামধন্য শিক্ষক মোঃ সেকান্দার আলী মিয়া-কে**। যার দোয়া ও ঐকান্তিক সহযোগিতা আমার জীবন পথে চলার একমাত্র পাথেয়, কর্মচাঞ্চল্য ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আমি তাঁর প্রতি চির ঋণী ও কৃতজ্ঞ। সাথে সাথে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার **শ্রদ্ধেয়া মা মোসা. আম্বিয়া খাতুন-কে**। যিনি আজীবন আমাদের সুখের জন্য নিজের সুখকে কুরবানী করেছেন। আমাদেরকে মানুষ করার জন্য তিনি সবচেয়ে বেশী প্রশংসার দাবীদার। সন্তানদের সুখ-সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আমার পিতা-মাতার নিরলস প্রচেষ্টা ও দোয়া আমাদের জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তাঁদের অপরিসীম আত্মত্যাগ এবং দোয়ার কারণেই আজ আমি জীবনের এতটুকু পথ পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছি। আজ এমনই এক স্মরণীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে, আমার পিতা-মাতার সুখ-শান্তি, সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

বিশেষ করে আমি কৃতজ্ঞ জ্ঞাপন করছি। আমার **সহধর্মিনী জনাবা রাশিদা পারভীন-এর** কাছে। তাঁর অপরিসীম ত্যাগ ও প্রেরণা আমার এ গবেষণা কাজে উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছে। আমি বারবার হতাশ হলেও সে আমার মনে আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন। এছাড়াও আমি **স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার দু'মেয়ে রায়হানা মাসনুন সাদিয়া ও রেজওয়ানা মাসনুন সায়েমা এবং একমাত্র ছেলে এম.এ. মুঈদ সায়েম-কে**। যারা সদাপাশে থেকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।। বিশেষ করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার **স্নেহধন্য কন্যা রেজওয়ানা মাসনুন সায়েমা-কে,** সে সব সময়ই তৎপর থেকে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। কম্পিউটারে অভিসন্দর্ভ লেখার ব্যাপারে সে যথেষ্ট তৎপরতার পরিচয় দিয়েছে।

আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত দেশী-বিদেশী লিখকদের রচনার সাহায্য-সহযোগিতা নিয়েছি । এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্ধৃতিতে সে সব লেখকদের নাম ও তাদের গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি। তবুও আমি আরেকবার তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় বিন্যাস

	পৃষ্ঠাঙ্ক
অঙ্গীকারনামা	এক
প্রত্যয়নপত্র	দুই
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	তিন-চার
প্রথম অধ্যায়	**১-৯**
ভূমিকা	১-৮
তথ্যনির্দেশ	৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	**১০-৩২**
রাবুবিয়াত দর্শনের উৎস্ ও আবুযর গিফারী (রা.) এর চিন্তাধারা	
১. রাব শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা	১১
১.১ কুরআনে রাব শব্দের ব্যবহার	১১-১৪
১.২ রাবুবিয়াত বা রাব্বিয়াত	১৪
১.৩ রাব্বিয়াতের বৈশিষ্ট্য	১৪-১৫
১.৪ রাব্বিয়াতের তাৎপর্য	১৬-১৭
২. আবুযর গিফারী (রা.) এর চিন্তাধারা	১৮-১৯
আবুযর গিফারী (রা.) এর চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক	২০-৩০
২.১ সম্পদের মোহ ত্যাগ	২০-২১
২.২ ভোগের চেয়ে ত্যাগের প্রতি গুরুত্বারোপ	২২-২৩
২.৩ মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করা	২৩-২৪
২.৪ দরবেশী তথা সংযত জীবন যাপন	২৪-২৬
২.৫ সম্পদের ব্যবহার	২৭-২৯
তথ্যনির্দেশ	৩০-৩২
তৃতীয় অধ্যায়	**৩৩-৫৭**
৩.১ আল্লামা আযাদ সুবহানীর চিন্তাধারা	
১. রাব্বানী দর্শন	৩৩-৩৪
২. আরবের রাব্বানী বিপ্লব	৩৪
২.১ রাব্বানী বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য	৩৪-৩৬
২.২ আরবের রাব্বানী বিপ্লবের গঠন-কৌশল	৩৬-৩৯
২.২.১ আরবের রাব্বানী সমাজ গঠনের কর্মসূচী	৩৯-৪১
৩. আরবের রাব্বানী বিপ্লবের গৃহীত কর্মসূচী	৪২-৪৭
৩.১ বিপ্লবকে স্থায়িত্ব করার কৌশল	৪৮
৪. সামঞ্জস্য বিধান	৪৮-৫৭
তথ্যনির্দেশ	৫৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়	**৫৯-১০৫**
বাংলাদেশের চিন্তাবিদদের মধ্যে রাবুবিয়াত দর্শনের অভ্যুদয় ও চর্চা	
৪. মাওলানা ভাসানী	৫৯-৭২
১.১ রাজনীতিবিদ ভাসানী	৬০-৬১
১.২ পীর হিসেবে ভাসানী	৬১
১.৩ ইসলামী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা	৬২-৬৩
১.৪ হুকুমাত-ই রাব্বানী প্রতিষ্ঠা	৬৩-৬৪
১.৫ হুকুমাত-ই রাব্বানিয়া সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	৬৪-৬৫
১.৬ হুকুমাত-ই রাব্বানিয়া সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা	৬৫
৪.১.৭ কমিউনিস্ট দক্ষিণপন্থী আলেমদের সাথে তাঁর মতের পার্থক্য	৬৬
১.৮ হুকুমাতে রাব্বানিয়া প্রতিষ্ঠার গৃহীত পদক্ষেপ	৬৬
১. সম্পদ জাতীয়করণ	৬৬
২. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	৬৭
১.৯ হাক্কুল্লাহ্ ও হাক্কুল ইবাদ সম্পর্কে অভিমত	৬৭-৭২
২ আবুল হাশিম	৭৩-৮৪
২.১ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	৭৩-৭৪
২.২ ধর্ম সম্পর্কীয় চিন্তাধারা	৭৪-৭৫
২.৩ ইসলাম	৭৬
২.৩.১ ইসলামী সংস্কৃতি	৭৭
২.৩.২ আধ্যাত্মিক জীবন	৭৮
২.৩.৩ নৈতিক জীবন	৭৮-৭৯
২.৩.৪ আধিমানসিক জীবন	৮০
২.৩.৫ সামাজিক জীবন	৮০-৮১
২.৩.৬ অর্থনৈতিক জীবন	৮১.৮৩
২.৩.৭ রাজনৈতিক জীবন	৮৩-৮৪
৩. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	৮৫-৯৭
৩.১ ইসলামী নীতির রূপায়ণ	
৩.১.১ সালাত	৮৮
৩.১.২ যাকাত	৮৮-৮৯
৩.১.৩ সিয়াম	৯৯-৯১
৩.১.৪ হজ্জ ও কুরবানী	৯১-৯২
৩.১.৫ হজ্জ ও কুরবানীর শিক্ষা	৯২-৯৩
৩.১.৬ জিহাদ	৯৩-৯৪
৩.১.৭ নারীর মর্যাদা	৯৪
৩.১.৮ খলীফার দায়িত্ব	৯৪-৯৫
৩.১.৯ অর্থনীতি	৯৫-৯৭
৪. প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম	৭৮-১০০

Dhaka University Institutional Repository

তমুদ্দুন মজলিসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৯৯
তমুদ্দুন মজলিসের মর্মকথা	১০০
৫. অধ্যাপক শাহেদ আলী	১০১
তথ্যনির্দেশ	১০২-১০৫
পঞ্চম অধ্যায়	**১০৬-১২০**
সাম্যবাদী দর্শনের সাথে রাবুবিয়াত দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা	
সাম্যবাদী দর্শন	১০৬-১১২
তুলনামূলক আলোচনা	
সাদৃস্যসমূহ	১১৩
বৈসাদৃস্যসমূহ	১১৩-১১৮
তথ্যনির্দেশ	১২০
উপসংহার	**১২১-১২৬**
গ্রন্থপঞ্জী	**১২৭-১৩৯**

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব। মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত। অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব। মানব জাতির সৃষ্টি প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্পাক বলেন, 'অইয ক্বালা রাব্বুকা লিলমালাইকাতি ইন্নী জা'ইলুন ফিল আরদি খালীফাহ ; ক্বালূ আতাজ্'আলু ফীহা মাইয়্যুফসিদু ফীহা অইয়াসফিকুদ্দিমাআ, আনহ্নু নুসাব্বিহু বিহামদিক্বা অনুকাদ্দিসু লাকা; ক্বালা ইন্নী আ'লামু মালা তা'লামূন।' অর্থাৎ স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদের বললেন: 'আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি'। তখন তারা বলল, 'আপনি কি সেথায় এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে সেখানে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে ? আমরাতো সদা আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি যা জানি তা তোমরা জান না।'[১] এমনিভাবে ফেরেশতাদের সাথে মত দ্বৈততার এক পর্যায়ে আল্লাহ্পাক মানুষ (আদম আ.)-কে সৃষ্টি করলেন। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্পাক ফেরেশ্তাদের, আদম (আ.)-কে সিজদা করার হুকুম দিলেন। একমাত্র ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করলেন। সিজদা না করার অপরাধে ইবলীস কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল।

পরবর্তীতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার জন্য হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-কে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। আল্লাহ্পাক মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ঘোষণা করলেন যে, তিনি মানবজাতিকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দেবার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠাবেন। আল্লাহ্র দেয়া জীবন-বিধান অনুসারে যারা নিজেদেরকে পরিচালনা করবেন, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্পাক তাঁর পূর্ববর্তী ঘোষণা অনুযায়ী মানবজাতি যখনই বিপদগামী হয়েছে, তখনই তাদের সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দেবার জন্য পৃথিবীতে নবী-রাসূলকে কিতাবসহ প্রেরণ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বলেন, 'অমা আরসালনা মিররাসূলিন ইল্লালিইয়ুতা

Dhaka University Institutional Repository

আবিইযনিল্লাহ।' অর্থাৎ রাসূল শুধু এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর আনুগত্য করা হবে।[২]

সর্বশেষ আসমানী কিতাব হল আল-কুরআন ; যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর অবতীর্ণ হয়। উক্ত কিতাব সম্পর্কে আল্লহ্ পাক নিজেই বলেছেন, 'আলিফ-লাম্ মিম্। যালিকাল, কিতাবু লারাইবা ফিহ্, হুদাল্লিল্ মুত্তাকিন।' অর্থাৎ ইহা সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই। এতে রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য পথের দিশা।[৩] অর্থাৎ আল কুরআন হল আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান এবং ইসলাম হল তাঁরই মনোনীত দ্বীন।[৪] সুতরাং স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে স্রষ্টা প্রদত্ত দ্বীন ও জীবন বিধান (আল-কুরআন) অনুসারে জীবন পরিচালনা করে নিজেকে ধন্য করা।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয় 'রাবুবিয়াত দর্শন'। রাবুবিয়াত দর্শনের মর্মবাণী উদ্ভূত হয়েছে আরবী 'রাব' নামক আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ থেকে। 'রাব' শব্দটি আরবী শব্দ। কুরআন কারীমের অনুবাদকেরা এই আরবী শব্দটির অনুবাদ ইংরেজীতে 'লর্ড' এবং বাংলায় 'প্রভু' দ্বারা করে থাকেন। কেউ কেউ পালনকর্তা শব্দটিও ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এগুলোর কোনটির দ্বারাই 'রাব' শব্দটির পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা যায় না । 'রাব' শব্দটির মূলত তিনটি অর্থ আছে : প্রথম অর্থে স্রষ্টা, দ্বিতীয় অর্থে পালনকর্তা এবং তৃতীয় অর্থে বিবর্তনকারী । 'রাব' শব্দটি আল্লাহ্ তা'আলার 'ইসমে সিফাত' বা গুণবাচক নাম। আর 'আল্লাহ্' শব্দটি ইলাহীর ইসমে জাত; যার মাধ্যমে ইলাহীর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। কুরআন কারীমে ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ্‌র এই ইসমে জাত ব্যবহৃত হয়েছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইস্‌মে সিফাত ব্যবহৃত হয়েছে।[৫]

আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ সত্তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান অথবা তাঁর অসীম গুণাবলীর প্রত্যক্ষ পরিচয় সম্ভব নয়; কারণ মানুষের জ্ঞান ও জ্ঞানলাভের শক্তি অপরিসীম হওয়া সত্ত্বেও অসীম নয়। আল্লাহ্ তা'আলার অসীম গুণাবলীর কণা মাত্রের পরিচয় পাই তাঁর সৃষ্ট এ বিশ্বজগতে। মহাবিশ্বের সাথে সংশ্লিষ্ট গুণাবলীর মধ্যে যে গুণ মহাবিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, গতি ও পরিবর্তন

Dhaka University Institutional Repository

তথা বিবর্তনের কারণ, সেই গুণের পরিচায়ক আল্লাহ্ তা'আলার গুণ বাচক নাম 'রাব'। যিনি অণু-পরমাণু কিংবা আমাদের অজ্ঞাত আরও সূক্ষ্মতর আদি সৃষ্টি হতে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, তারকাশোভিত বিস্ময়কর এই বিরাট বিশ্বের স্রষ্টা, যিনি এই বিশ্বজগতের প্রতিটি নির্জীব ও সজীবের পালনকর্তা এবং তাদের প্রাথমিক অবস্থা হতে চরম বিকাশের নিয়ন্তা, তারই এ সকল গুণের গুণবাচক নাম 'রাব'। আর এদিকে লক্ষ্য করেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' অর্থাৎ সকল প্রশংসা জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই, অন্য কথায়, সকল হামদ্ মহাবিশ্বের 'রাব' আল্লাহ্র।"[৬]

আল্লাহ্ তা'আলা মহাবিশ্বের 'রাব' এ বাক্যাংশে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা মহাবিশ্বের তথা মানুষের স্রষ্টা, পালক ও বিবর্তক। মানুষকে তিনি সর্বোত্তম ছাঁচে এবং অপরিসীম সম্ভাবনার আধার করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কর্মদোষে সে নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করতে হলে ইহজীবনে একদিকে যেমন প্রয়োজন বস্তু সম্পদের অন্যদিকে জীবনের প্রতি সঠিক দৃষ্টি-ভঙ্গি লাভের জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ জ্ঞানের। আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে সে জ্ঞান দান করেছেন। কুরআনের নির্দেশিত সৎকর্মগুলো মানুষের অগ্রগতির সহায়ক এবং এটিতে যে কর্মগুলোকে মন্দ বলা হয়েছে সেগুলো অগ্রগতির পরিপন্থী। সুতরাং আল্লাহ্ মহাবিশ্বের 'রাব' এ জ্ঞানের দ্বারা কুরআন কারীম মানুষকে তাঁর রাবের পালন নীতির জ্ঞান অর্জন করে সে জ্ঞানালোকে নিজ জীবন গঠনের শিক্ষা দিয়েছেন।

সকল হামদ্ মহাবিশ্বের 'রাব' আল্লাহর। এই বাক্যের দ্বারা কুরআন কারীম এই শিক্ষাও দিচ্ছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা 'রাব' বলেই সকলের হামদের অধিকারী। একইভাবে মানুষও অহম সত্তার পূজারী না হয়ে ভূমা সত্তার বা পরার্থপরতার উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমেই অন্যের প্রশংসা পেতে পারে। 'রাব' শব্দের সংকীর্ণতম ও সাধারণ অর্থ লালন-পালন, যেমন-বুভুক্ষুকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান ইত্যাদি। মানুষের উত্থান-পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে ব্যক্তি বা জাতির মধ্যে স্রষ্টার লালনবাদী গুণের প্রবাল্য থাকে, সেই ব্যক্তি বা জাতি বিশেষ সম্মান বা মর্যাদার অধিকারী

Dhaka University Institutional Repository

হয়। পক্ষান্তরে, ব্যক্তি জীবনে যখন অহমসত্তার প্রাধান্য দেখা দেয়, তখন আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দেখা দেয় সংঘর্ষ ; ফলে দুর্বল হয় সমাজ সংহতি। আর জাতির ললাটে নেমে আসে দুর্দশা ও দুর্যোগের অমানিশা।

ভূমা সত্তার প্রাধান্যে ব্যক্তি যখন সকলের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেয় তখন সে সকলের নিকট থেকে লাভ করে স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা ও শ্রদ্ধা। এ পথেই ইয়েমেনের যুবরাজ হাতিম তাই, বাংলার হাজী মুহম্মদ মুহসীন যুগ যুগ ধরে মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করে আসছেন। কাজেই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে যারা পরোপকারী তাদের উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের ইহসান স্বীকার করে না, সে আল্লাহরও ইহ্সান স্বীকার করতে পারে না।"

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের 'রাব' ইহাই আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মানুষের সম্পর্কের পূর্ণ পরিচয় নয়। কুরআন কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা এটিও ঘোষণা করেছেন যে, মানুষকে তিনি পৃথিবীতে তাঁর 'ইসমে সিফাত' 'রাব' এর খলীফা বা প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। সে দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করার জন্য মানুষকে তিনি তাঁর উক্ত নামের পরিপূরক গুণাবলীতে বিভূষিত করেছেন। রাসূলে কারীম (স.) শিক্ষা দিয়েছেন "নিজেকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত কর।" যিনি সর্বান্তঃকরণে সক্রিয়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মহাবিশ্বের 'রাব' আল্লাহ্ এবং পৃথিবীতে তিনি আল্লাহ্র 'ইসমে সিফাত' 'রাব' এর খলীফা, যিনি আন্তরিকতা সহকারে চেষ্টা করে নিজেকে উক্ত গুণে গুণান্বিত করে দৈনন্দিন জীবনে সেই আদর্শে নিজেকে গঠন করতে এবং সেই সঙ্গে অপরের নিকট হতে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্বপ্রকার উপকারের জন্য স্বকৃতজ্ঞ থাকতে, একমাত্র তাঁরই চিত্ত বিকারমুক্ত ও তৃপ্ত-প্রশান্ত এবং একমাত্র তারই অন্তর হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হতে পারে, সকল হাম্দ্ মহা বিশ্বের 'রাব' আল্লাহ্র।

আবার যিনি মহাবিশ্বের 'রাব' তিনিই রাহ্মান (দয়ালু), রাহীম (মেহেরবান) এবং দ্বীন দিবসের মালিক। ("আররাহ্মানির রাহীম। মালিকিইয়াওমিদ্দীন।")[৭] জীব মাত্রেরই জীবনধারণের জন্য আলো-বাতাস, পানি প্রভৃতি এমন কতকগুলো অপরিহার্য বস্তুর প্রয়োজন, যা সে সৃষ্টি করতে পারে না, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার করুণায় জীবের এ

Dhaka University Institutional Repository

সমস্ত অপরিহার্য বস্তুসমূহ পূর্বাহ্নে স্থির করে কর্ম প্রচেষ্টা নিরপেক্ষভাবে সকলকে সরবরাহ করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলার এ সমস্ত দান সার্বিক ও কর্ম নিরপেক্ষ। মুমিন-কাফের, পণ্ডিত-জাহিল, নির্বিশেষে সকলের প্রতিই আল্লাহ্ তা'আলার এ দান সমভাবে বিতরিত হয়। তাছাড়া তিনি এ দানগুলোর জন্যও কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা করেন না। রাব্বুল আলামীনের এ সমস্ত গুণের সমন্বয়ই হচ্ছে তাঁর গুণবাচক নাম রাহমান।[৮] উল্লেখ্য যে, অন্যান্য জীবের মত মানুষের জৈবিক প্রয়োজনের সাথে সাথে রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা। বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আল-কুরআন হচ্ছে আয়াস নিরপেক্ষ ঐশী দান।

আর্-রাহীম আল্লাহ্ তা'আলার আর একটি গুণবাচক নাম। সকল জীব আর্-রাহ্মানের নিকট হতে স্বীয় প্রয়োজনে আয়াস নিরপেক্ষ দান লাভ করে সেগুলোর সদ্ব্যবহারের দ্বারা আল্লাহ্র রাহমতে নিজ নিজ কর্মফল লাভ করে। রাব্বুল আলামীনের যে গুণ জীবকে তার কর্মের জন্য আপন রাহ্মত সিঞ্চিত ফলাফল দান করে আল্লাহ্ তা'আলার সেই গুণ প্রকাশক নাম রাহীম। আর-রাহমানের দান কর্ম নিরপেক্ষ এবং আর-রাহীমের দান কর্ম সাপেক্ষ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "মানুষ যার জন্য চেষ্টা করে তা ব্যতীত কিছুই তার প্রাপ্য নয়।"[৯] তিনি আরো বলেন : "যে আত্মা যা উপার্জন করে, তাই তার প্রাপ্য এবং সে তার নিজের কর্মের কুফলই ভোগ করে।"[১০]

আল্লাহ্ দ্বীন দিবসের মালিক (*মালিকিইয়াওমিদ্দীন*)। তবে আল্লাহ তা'আলার মালিকানা কোন রূপ শর্তাধীন নয়, সার্বভৌম। দ্বীন ( ) এই আরবী শব্দটির দৃঢ় অর্থ কুরআনুল কারীমেই উল্লেখ আছে। দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বলেন: 'ফিত্রাতাল্লা হিল্লাতি ফাতারান্নাসা আলাইহা লাতাব্দীলা লিখাল্ক্বিল্লাহ্' অর্থাৎ–উহা আল্লাহ্র ফিতরাত, যার ভিত্তিতে মানুষের ফিতরাত বা প্রকৃতি গঠন করা হয়েছে।[১১] সুতরাং স্পষ্টত:ই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের প্রকৃতিই হচ্ছে মানুষের দ্বীন। অন্যান্য জড় ও জীব সত্তার দ্বীন হতে মানুষের দ্বীনের পার্থক্য এই যে, নিজের দ্বীন তথা প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দিয়েছেন। সে স্বাধীনতার অপব্যবহারের দ্বারা মানুষ নিজের নশ্বর ও

Dhaka University Institutional Repository

অবিনশ্বর সত্তার ক্ষতি সাধন করে। কুরআন কারীম মানুষকে তাঁর সনাতন প্রকৃতির সাথে পরিচিত করেন এবং মানব প্রকৃতির সাথে সুসামঞ্জস্য এক জীবন ব্যবস্থা দেন। এই জীবন-ব্যবস্থায় মানুষ তার স্রষ্টার নিকট আত্মসমর্পণ করে তথা নিজের সনাতন প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে তার সাথে শান্তি স্থাপন করে স্রষ্টার মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সফল করার শিক্ষা দেয়। এ কারণেই কুরআন কারীমে মানুষের দ্বীনকে ইসলাম (আত্মসমর্পণ ও শান্তি) নামে অভিহিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, 'আল ইয়াওমা আক্‌মালতু লাকুম দ্বীনাকুম অআতমামতু আলাইকুম নিমাতি অ রাদীতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীন।' অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তেমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকেই তোমাদের জন্য দ্বীন নির্দিষ্ট করলাম।"[১২]

উল্লেখ্য, মানুষের আখিরাত তার দৈনন্দিন মুহূর্তিক কর্মফল এবং জীবনের সামগ্রিক কর্মফলের উপরই নির্ভর করে। মৃত্যুর পরে আখিরাতে ইহ্‌জীবনের কর্মফলের চরম ইয়াওমিদ্দীন (কর্মফল) লাভ হয়। এই ইয়াওমিদ্দীনের দাতা আল্লাহ্। তাঁর করুণা ব্যতিরেকে কোন কার্যেই সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এমনকি পরকালীন মুক্তিও। কাজেই মানুষের কর্মফলের মূল মালিক আল্লাহ্ যিনি মানুষের কর্মনিষ্ঠার উপর দৃষ্টি রেখে তাঁর রাহমত দ্বারা মানুষের ঈপ্সিত কর্মফল লাভের পরিবেশ সৃষ্টি করে কর্মফল দান করেন।

রাব্বুল আলামীনের বিশ্বপালন-নীতির মূল তাৎপর্য এই যে, যেহেতু তিনি কেবল দানই করেন, কিছুই গ্রহণ করেন না; তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে। সুতরাং রাব্বুল আলামীনের খলীফা মানুষের কর্তব্য নেওয়া অপেক্ষা দেওয়ার প্রবণতার উৎকর্ষ সাধন করা। এই মনোভংগি গঠনের উপরই বিশ্বের শান্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। এ মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানুষ যখন তার জীবন গড়ার প্রচেষ্টা করবে তখনই দেওয়া-নেওয়া হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে এবং সেই সংগে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের সর্ব পর্যায়ে শাসন-শোষণের ঘটবে অবলুপ্তি। যিনি মহা-বিশ্বের 'রাব', তিনিই রাহমান ও রাহীম। সুতরাং মানুষেরও কর্তব্য এই দুই গুণের অনুশীলন করা। কারো নিকট কিছু চাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট হীনতা আছে এবং সে হীনতা মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী। রাব্বুল আলামীনের খলীফা মানুষের কর্তব্য পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীর সাথে এরূপ একান্ত সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

থাকা যাতে সে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূর্বাহ্নে উপলব্ধি করে এবং কাউকে চাওয়া-রূপ হীনতার আশ্রয় গ্রহণ করতে না দিয়ে সাধ্যমত সক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাব্বুল আলামীনের খলীফা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্যও এই নীতিরই সুষ্ঠু বাস্তবায়ন; অর্থাৎ প্রত্যেক কর্মক্ষম নর-নারীকে আপন আপন প্রতিভা ও রুচি মোতাবেক কর্মের মাধ্যমে জীবন বিকাশের জন্য অপরিহার্য উপাদানসমূহ যথা- খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান সংস্থানের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দান করা এবং অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, শিশু প্রভৃতি যারা উক্ত উপাদানসমূহ সংস্থানের জন্য শ্রম দানে অক্ষম তাদের লালন-পালনের পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা। রাহমানের দান চিন্তা-বিশ্বাস-কর্ম-নিরপেক্ষ ও সার্বিক; তাতে পাপ-পুণ্য বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন প্রশ্ন নাই সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা রাহমান-ইহাতে বিশ্বাসী মু'মিনের কর্তব্য বর্ণ-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বুভুক্ষুকে অন্ন দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, অজ্ঞানকে জ্ঞান দান ও ভগ্ন-স্বাস্থ্যকে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করা।

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি ভূমিকাসহ পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। মূল অধ্যায়সমূহ হচ্ছে, 'রাবুবিয়াত দর্শনের উৎস ও আবুযর গিফারী (রা.) এর চিন্তাধারা', 'আল্লামা আযাদ সুবহানীর চিন্তাধারা', 'বাংলাদেশে রাবুবিয়াত দর্শনের অভ্যুদয় ও চর্চা', 'সাম্যবাদী দর্শনের সাথে রাবুবিয়াত দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা' এবং উপসংহার।

'রাবুবিয়াত দর্শনের উৎস ও আবুযর গিফারী (রা.) এর চিন্তাধারা' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'রাব' শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা, 'রাবুবিয়াত' বলতে কী বুঝায়, 'রাব্বিয়াত'-এর বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর আলোচনা করা হয়েছে 'রাবুবিয়াত' দর্শন সম্পর্কে আবুযর গিফারী (রা.) এর চিন্তাধারা। 'রাবুবিয়াত' শব্দটি এসেছে আরবী 'রাব' শব্দ থেকে। 'রাব' শব্দটি কুরআনে পাঁচ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, 'রাব' শব্দটি যদিও কুরআনে পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয় তবুও এই পাঁচটি অর্থ মূলত স্রষ্টার প্রতিপালন গুণেরই প্রতিধ্বনি। অতঃপর সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, যদিও 'রাবুবিয়াত' দর্শনের উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীস তৎসত্ত্বেও এই দর্শনের প্রকৃত প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে হযরত আবুযর গিফারী (রা.) এর চিন্তাধারার মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়, 'আল্লামা আযাদ সুবহানী' শীর্ষক আলোচনায় আরবের রাব্বানী বিপ্লবের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাব্বানী বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য যে সমস্ত কার্য প্রণালী প্রয়োজন প্রথমে তা পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর দেখানো হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (স.) কীভাবে উক্ত নীতি অনুসরণ করে হুকুমাত-ই রাব্বানী প্রতিষ্ঠা করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়, 'বাংলাদেশে রাবুবিয়াত দর্শনের অভ্যুদয় ও চর্চা' শীর্ষক আলোচনায় আমাদের দেশে যারা রাবুবিয়াত দর্শনের চর্চা ও প্রচার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের চিন্তাধারা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে রাবুবিয়াত দর্শনের স্বরূপকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে। এখানে আলোচনা করা হয়েছে মাওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম, অধ্যাপক শামসুল আলম এর পালনবাদী দর্শন এবং এসব আলোচনার মাধ্যমে এ সত্যই প্রতিষ্টার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কেবল রাবুবিয়াত দর্শনের মাধ্যমেই বর্তমান অশান্ত বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

পঞ্চম অধ্যায়, 'সাম্যবাদী দর্শনের সাথে রাবুবিয়াত দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা' শীর্ষক আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, সাম্যবাদী দর্শনের চেয়ে ইসলামী দর্শন তথা রাবুবিয়াত দর্শনই গ্রহণযোগ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়, উপসংহারে বর্তমান অভিসন্দর্ভের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

অর্তমান অভিসন্দর্ভটি মানববিদ্যার (Humanities) অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। তাই অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমরা বর্ণনামূলক (Descriptive) এবং বিশ্লেষণমূলক (Analytic) এই দুই পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। কোরআন, হাদীসসহ অন্যান্য উৎস থেকে যে সব তত্ত্ব পাওয়া গেছে সেগুলো বিশ্বস্ততার সাথে সুবিন্যস্ত ও সুশৃংখলভাবে বর্ণনা এবং যথাযথ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. *আল কুরআন*, ২:৩০

২. প্রগুক্ত , ৪:৬৪

৩. প্রগুক্ত, ২:১–২

৪. প্রগুক্ত, ৫:৩

৫. দ্রষ্টব্য, আবুল হাশিম, *রব্বানী দৃষ্টিতে*, ঢাকা: আবুজর গিফারী সোসাইটি, (সন উল্লেখ নেই), গ্রন্থকারের কথা

৬. *আল কুরআন* ১:১

৭. প্রাগুক্ত, ১:২–৩

৮. আবুল হাশিম, *রব্বানী দৃষ্টিতে*, ঢাকা: আবুজর গিফারী সোসাইটি, পৃ.৬

৯. প্রাগুক্ত, ৫৩:৩৯

১০. প্রাগুক্ত, ২:৮৬

১১. প্রাগুক্ত, ৩০:৩০

১২. প্রাগুক্ত, ৫:৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাবুবিয়াত দর্শনের উৎস ও আবুযর গিফারী (রা.) এর চিন্তাধারা

'রাবুবিয়াত' দর্শনের মর্মবাণী উদ্ভূত হয়েছে 'রাব' নামক আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ থেকে। এটি আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের (আসমাউল হুসনা) অন্তর্ভুক্ত একটি নাম হলেও এর গুরুত্ব অন্যান্য নাম সমূহ থেকে ভিন্ন ধর্মী। 'রাব' শব্দের ইসলামী পরিভাষাগত অর্থ হল স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক ; রাবের এই ধারণার উপলব্ধি থেকে, যে দর্শনের সূত্রপাত হয়েছে তাই 'রাবুবিয়াত' দর্শন নামে পরিচিত। একটি দার্শনিক চিন্তাধারা হিসেবে 'রাবুবিয়াত' দর্শনের সূত্রপাত করেন আল্লামা আজাদ সুবহানী। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স.) ও হযরত আবুযর গিফারী (রা.) কে অনুসরণ করেছিলেন। হযরত আবুযর গিফারী (রা.) এর জীবন ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। পার্থিব সম্পদের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিলনা। তিনি ছিলেন সাম্যের মূর্ত প্রতীক। আযাদ সুবহানী এ দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সকল মানুষের সমান অধিকারের কথা বলেছেন। ইসলামী সাম্যের এ চেতনা সুবহানী থেকে আমাদের দেশে প্রথমত লাভ করেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আবুল হাশিম, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম ও অধ্যাপক শাহেদ আলী। এ দর্শনের প্রভাবে পরবর্তীকালে প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক শাহেদ আলী, অধ্যাপক অবদুল গফুরসহ আরো অনেকে 'তমুদ্দুন মজলিস' গঠন করেন। এ দর্শন একটি জীবনমুখী দর্শন। সমাজে বসবাসরত মানবগোষ্ঠী, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে এর আওতাভুক্ত অর্থাৎ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনই এর মূল উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

১. রাব শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা

'রাব' শব্দটি একটি সারগর্ভ অননুবাদ্য আরবী শব্দ। (ر ب ب) ধাতু থেকে শব্দটি নিষ্পন্ন। এর প্রাথমিক ও মৌলিক অর্থ প্রতিপালন। অতঃপর তা থেকে ভোগ-ব্যবহার তত্ত্বাবধান, অবস্থার পরিবর্তন সাধন, সমাপ্তিকরণ ও পরিপূর্ণতা বিধানের অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। এর ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে প্রধান্য, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও প্রভুত্বের অর্থ। আল-কুরআনে 'রাব' শব্দটি পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১] কুরআনে শব্দটি কোথাও পাঁচ অর্থে কোথাও এক বা দুই অর্থে, কোথাও এর চেয়ে বেশী, আবার কোথাও একইসাথে পাঁচটি অর্থেই বোঝান হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

১.১ কুরআনে রাব শব্দের ব্যবহার

এক. প্রতিপালক, প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহকারী, তরবিয়ত ও ক্রমবিকাশ দাতা। যেমন- কুরআনে বলা হয়েছে : "ক্বালা মাআযাল্লাহি ইন্নাহূ রাব্বী আহ্সানা মাসওয়াইয়া; ইন্নাহূ লাইয়ুফ্লিহুয্ যালিমূন"।

অর্থাৎ সে বললো, 'আল্লাহ্র আশ্রয়। যিনি আমাকে ভালভাবে রেখেছেন, তিনিই তো আমার রাব'।[২]

দুই. যিম্মাদার, তত্ত্বাবধায়ক, দেখাশোনা, এবং অবস্থার সংশোধন–পরিবর্তনের দায়িত্বশীল। যেমন–কুরআনে বলা হয়েছে –

ক. "ফাইন্নাহুম আদুব্বুললী ইল্লা রাব্বাল আলামিন। আল্লাযী খালাক্বানী ফাহুয়া ইয়াহদীন। অল্লাযিহুয়া ইয়ুত ইমুনী ওয়া ইয়াসক্বীন। অইযা মারিদতু ফাহুয়া ইয়াশফীন"।

অর্থাৎ 'বিশ্বজাহানের রাব, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমাকে পথ প্রদর্শন করেন, পানাহার করান, আমি অসুস্থ হলে আরোগ্য দান করেন, তিনি ছাড়া তোমাদের এ সকল রাব তো আমার দুশমন'।[৩]

খ. 'রাব্বুল মাশরিকি অল মাগরিবি লাইলাহা ইল্লাহুয়া ফাত্তা খিযহু ওয়াক্বীলা।"

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ 'মাশরিক-মাগরিব; প্রাচ্য-প্রতীচ্যের রাব। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। সুতরাং তাকেই তোমার উকিল (নিজের সকল ব্যাপারে যামিন ও যিম্মাদার) হিসেবে গ্রহণ করো'।[৪]

গ. 'হুয়া রাব্বুকুম, অইলাইহি তুরজাউন"

অর্থাৎ 'তিনিই তো তোমাদের রাব, তোমরা ঘুরেফিরে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে'।[৫]

ঘ. "অমা বিকুম মিন না'মাতিন ফামিনাল্লাহি সুম্মা ইযা মাচসাকুমুদ দুররু ফাইলাইহি তাজ্বআরূন। সুম্মা ইযা কাশাফাদ দুররা আনকুম ইযা ফারীকুম মিনকুম বিরাব্বিহিম ইয়ুশরিকুন।"

অর্থাৎ 'তোমরা যে নিয়ামত সম্ভোগই লাভ করছো, তা লাভ করছো আল্লাহ্র তরফ থেকে। অতঃপর তোমাদের ওপর কোন বিপদ আপতিত হলে হতচকিত হয়ে তোমরা তাঁর হুযুরেই প্রত্যাবর্তন করো। কিন্তু তিনি যখন তোমার বিপদ দূর করে দেন, তখন তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে ,যারা (নিয়ামত দান ও দুর্যোগ মুক্তিতে) আপন রাব-এর সাথে অন্যদেরকেও শরীক করতে শুরু করে'।[৬]

তিন. যিনি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোক সমবেত হয়।

যেমন-কুরআনে বলা হয়েছে–

ক. " ইত্তাখাযু আহ্ বারাহুম অরুহ্বানাহুম আরবাবাম মিন দুনিল্লাহি"।

অর্থাৎ 'তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের দরবেশ, ওলামা-পাদ্রী-পুরোহিতদেরকে নিজেদের রাব বানিয়ে নিয়েছে'।[৭]

খ. "অলা-ইয়াত্তাখিযা বা'দুনা বা'দান আরবাবাম মিনদূনিল্লাহ্"

অর্থাৎ 'আর আমাদের কেউ যেন আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে নিজের রাব না বানায়'।[৮]

উক্ত আয়াত দুটিতে আরবাব (রাব এর বহুবচন) অর্থ সেসব ব্যক্তি, জাতি ও জাতির বিভিন্ন দল, যাদেরকে সাধারণ ভাবে নিজেদের পথপ্রদর্শক ও নেতা (কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব) স্বীকার করা হয়েছে।

চার নেতা-সর্দার, যার আনুগত্য করা হয়। ক্ষমতাশালী কর্তা ব্যক্তি, যার নির্দেশ চলে, যার কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়, হস্তক্ষেপ ও বল প্রয়োগের অধিকার আছে। যেমন- কুরআনে বলা হয়েছে–

Dhaka University Institutional Repository

(ক) "আম্মা আহাদুকুমা ফাইয়াসক্বী রাব্বাহূ খামরা অআম্মাল আখারু ফাইয়ুসলাবু ফাতা'কুলুত তাইরুমির রা'সিহ্... ইন্দা রাব্বিকা, ফাআনসাহুশ শাইতানু যিক্‌রা রাব্বিহী ফালাবিসা ফিস সিজ্বনি বিদ'আসিনীন"।

অর্থাৎ '(ইউসুফ বললেন,) অবশ্য তোমাদের একজন তার রাবকে শরাব পান করাবে। তাদের দু'জনের মধ্যে যার সম্পর্কে ইউসুফের ধারণা ছিল, সে মুক্তি লাভ করবে। ইউসুফ তাকে

বললেন: তোমার রাব- এর কাছে আমার কথা বলো। কিন্তু শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিলো, তাই আপন রাব-এর কাছে ইউসুফের কথা উল্লেখ করতে তার স্মরণ ছিল না'।[৯]

(খ) "ফালাম্মা জ্বাআহু রাসূলু ক্বালারজি' ইলা রাব্বিকা ফাসআলহু মা বালুন নিসওয়া তিল্লাতী ক্বত্তানা আইদিয়াহুন্না; ইন্না রাব্বী বিকাইদিহিন্না 'আলীম"।

অর্থাৎ 'বার্তাবাহক ইউসুফের কাছে হাযির হলে ইউসুফ তাকে বললো : তোমার রাবের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর যেসব মহিলারা নিজেরাই নিজেদের হাত কেটেছিলো, তাদের কি অবস্থা? আমার রাবতো তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেনই'।[১০]

এসব আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরীয়দের সাথে কথা-বার্তাকালে মিসরের শাসনকর্তা ফিরাউনকে তাদের রাব বলে বারবার উল্লেখ করেছেন। কারণ তারা তখন তার কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতো, তাকে আদেশ নিষেধের অধিকারী জ্ঞান করতো, তখন সে-ই ছিল তাদের রাব। পক্ষান্তরে, হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহ্‌কে তাঁর রাব বলছেন; কারণ তিনি মিসরের শাসনকর্তা ফিরাউনকে নয় বরং কেবল আল্লাহ্‌কেই সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং আদেশ নিষেধের মালিক মনে করেন।

পাঁচ.

(ক) মালিক-মুনীব। যেমন- কুরআনে বলা হয়েছে–"ফালইয়া'বুদূ রাব্বা হাযাল বাইত। আল্লাযী আত 'আমাহুম মিন জ্ব'ইওঁ অআমানাহুম মিন খাওফ"।

অর্থাৎ–'সুতরাং তাদের উচিত, এ ঘরের ইবাদত করা, যিনি তাদের রিযিক সরবরাহের ব্যবস্থা করছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ রেখেছেন'।[১১]

(খ) "রাব্বুস সামাওয়াতি অলআরদি অমা বাইনাহুমা অরাব্বুল মাশারিক্ব"।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ-'তিনি আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুর রাব এবং তিনি রাব উদয়াচল সমূহেরও'।[১২]

(গ) "সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইয্যাতি 'অম্মা ইয়াসিফূন"।

অর্থাৎ-'তোমার রাব যিনি সম্মান ও ক্ষমতার মালিক ওরা তাঁর সম্পর্কে যেসব দোষ ত্রুটির কথা বলছে, তিনি সেসব থেকে মুক্ত পবিত্র'।[১৩]

উপর্যুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা 'রাব' শব্দের অর্থ সন্দেহাতীত ভাবে নির্ণীত হয়েছে।

১.২ রাবুবিয়াত বা রাব্বিয়াত

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে 'রাবুবিয়াত' শব্দটি এসেছে 'রাব' থেকে। আমরা দেখেছি 'রাব' এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল বিশ্বজগতের সৃজন, প্রতিপালন ও বিবর্তনের কর্তৃত্ব। কাজেই আর-'রাব' হচ্ছেন মহাবিশ্বের একক স্রষ্টা, পালক ও বিবর্তক। মানুষও এক অর্থে স্রষ্টা বটে; কিন্তু সে শূন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। সে নিজের জীবন যাপন, আত্মরক্ষা এবং আত্মোন্নয়নের রীতি নির্ধারণ ও উপায় অবলম্বন করতে পারে মাত্র। প্রত্যেকটি জীবন দর্শন-ই মানুষের আত্মরক্ষা ও আত্মোন্ননয়নের সমস্যাদি সমাধানের ব্যাপারে নিজ বিশিষ্ট সমাধান দিয়ে থাকে। অন্যান্য বিশিষ্ট মতবাদের মতো ইসলামেরও এসব জীবন সমস্যা সমাধানের নিজস্ব রীতি-নীতি রয়েছে। আর 'রাব' এর পথ পদ্ধতি তথা নীতি-বিধান বিশ্ব প্রকৃতির বিকাশ ধারায় বিধৃত রয়েছে এবং আল-কুরআনের মাধ্যমে তা অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় একেই বলে 'রাব্বিয়াত' বা 'রাবুবিয়াত'। অর্থাৎ মানব জাতির জীবন সমস্যা সমাধানের জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনের মাধ্যমে পালনবাদী যে জীবন বিধান দিয়েছেন তাকেই বলে 'রাব্বিয়াত'।

১.৩. রাব্বিয়াতের বৈশিষ্ট্য

'রাব্বিয়াত' বা বিশ্ব প্রকৃতির পালন ও বিবর্তন সংক্রান্ত ঐশী রীতির কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আবুল হাশিমের মতে এসব বৈশিষ্ট্য হল পাঁচটি।[১৪] যেমন –

Dhaka University Institutional Repository

(ক) আল্লাহ্ কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা না করেই তাঁর সৃষ্ট জীবের মঙ্গল সাধন করেন। সমাজের অধিকাংশ মানুষ মনে করেন যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার এবং অকৃতজ্ঞতার কারণে আল্লাহ্ তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু আল-কুরআনে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্ সব রকমের অভাবের ঊর্ধ্বে এবং তিনি মানুষকে যে সমস্ত আদেশ নিষেধ করেছেন তা মানুষের কল্যাণার্থেই করেছেন। আল্লাহ্র আদেশ মান্য করে মানুষ নিজেরই কল্যাণ সাধন করে এবং অমান্য করে তাঁর নিজেরই অপকার করে।

(খ) সৃষ্ট জীবের বেঁচে থাকার জন্যে যা প্রয়োজন, অর্থাৎ জীবন ধারণের জন্য যা কিছু প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন এবং যা সে নিজে উৎপাদন করতে অক্ষম তা আল্লাহ্ বিনা শর্তে অবাধে দান করেন। অর্থশাস্ত্রের ভাষায় এদেরকেই বলা হয় 'প্রকৃতির দান'। আলো-বাতাস-পানির মত অবতীর্ণ জ্ঞান বা 'ওহীর জ্ঞান' ও এ ধরণের একটি দান বিশেষ।

(গ) আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রয়োজনীয়তা পূর্ব থেকেই জ্ঞাত এবং প্রকৃত পক্ষে জীব-জন্তুর প্রয়োজনে আসার আগে থেকেই তিনি এ সমস্ত বস্তু সরবরাহ করে থাকেন। যেমন-সন্তান জন্মের পূর্ব থেকেই প্রসূতির স্তনে তার আহার্য সঞ্চিত করেন।

(ঘ) আল্লাহ্র এসব দান স্বতঃপ্রবৃত্ত ও সর্বজনীন। এ ক্ষেত্রে অল্লাহ্ ভাল-মন্দ, পূণ্যবান-পাপী, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীর মধ্যে কোন প্রভেদ করেন না। 'রাব্বিয়াতে'-এর এই চারটি বৈশিষ্ট্য অন্তর্নিহিত রয়েছে আল্লাহ্র গুণবাচক নাম 'আর্-রাহ্মান'এ।[১৫]

(ঙ) 'আর-রাহীম' হিসেবে আল্লাহ্ ন্যায়বিচার করেন; কিন্তু সেক্ষেত্রেও তাঁর বিচার হয় করুণা-নিষিক্ত। আল্লাহ্র দানের যে যথার্থ সদ্ব্যবহার করবে সে পুরস্কৃত হবে, আর যে অপব্যবহার করবে সে শাস্তি পাবে। এখানে পুরস্কারের অর্থ নিজের কল্যাণ এবং শাস্তির অর্থ নিজেরই ক্ষতি।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪. রাব্বিয়াতের তাৎপর্য

'রাব্বিয়াত'-এর নীতি অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজ প্রচেষ্টার ফল লাভ করেন। সৃষ্টি জগত সম্বন্ধে বলা যায় যে, 'আর রাব' এর সৃজন বিধি সম্পূর্ণ নিখুঁত এবং সে মতে প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের রয়েছে তার সার্থকতম নিয়তিতে পৌঁছার সম্ভাবনা। রাব্বিয়াত বা সৃজন পালন ও বিবর্তনের ঐশী নীতিই হল মানুষের 'খিলাফতের' মূল কথা। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর রাব্বিয়াতের প্রতিভূ করে এবং এই রাব্বিয়াতের রীতি অনুযায়ী বিশ্বস্ততার সাথে নিজের ও চারপাশের সৃষ্ট জীবের লালন-পালনের দায়িত্ব দিয়ে। এই মহান কর্তব্যের যথাযথ সম্পাদনাই হল সত্যিকারের ইবাদত বা আল্লাহ্‌র দাসত্ব। ইহাই হল ইসলামের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য যাকে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি বিনা শর্তে ও দ্বিধাহীন আত্মসমর্পণ। ব্যক্তিগত কিংবা জাতীয় জীবনে মানুষের মহত্ত্ব নির্ভর করে তাঁর ব্যবহারের উপর। তাই খিলাফতের এ নীতির সাথে যার ব্যবহারিক জীবন সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সে-ই মহৎ। আর যার জীবন অসামঞ্জস্য অর্থাৎ যে অন্যের প্রতি কর্তব্যের চিন্তা বিসর্জন দিয়ে কেবল আত্মপূজায় বিভোর থাকে সে হল 'আস্‌ফালুস্‌ সাফেলীন' বা নিকৃষ্টের নিকৃষ্টতম। জাতির উত্থান-পতনের রহস্য এতেই প্রচ্ছন্ন। আর 'রাব' এর ন্যায় বিচারের এই নীতির উল্লেখ রয়েছে আল-কুরআনে বলা হয়েছে : 'আমি পৃথিবীতে তাদের পর তোমাদেরকে আমার প্রতিভূ করে পাঠিয়েছি – দেখতে যে তোমরা কিরূপ ব্যবহার কর।' 'রাব্বিয়াত'-এর 'খালীফা' হিসেবে মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব দ্বিবিধ; তা হল: নিজের প্রতি কর্তব্য ও অপরের প্রতি কর্তব্য। সাধারণ ভাষায় প্রথমটিকে বলা হয় হাক্কুল্লাহ্‌ বা আল্লাহর প্রাপ্য (হাক্ক) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'হাক্কুল ইবাদ্‌' বা আল্লাহ্‌র দাসদের প্রাপ্য।

হাক্কুল্লাহ্‌ আসলে হল 'হাক্কুন্‌-নাফ্‌স' অর্থাৎ নিজের জন্য প্রাপ্য; কেননা আল্লাহ্‌ সকল অভাব অনটনের উর্ধ্বে এবং তাঁর নিজ উপকারের জন্য তিনি সৃষ্ট জীবের উপর নির্ভরশীল নন। ঈমানদার বান্দা 'সালাত'-এ তাঁর সামনে ভূলুণ্ঠিত হয়ে বা রমজানে উপবাস ব্রত পালন করে আল্লাহ্‌র কোন উপকার সাধন করে না, নিজেরই কল্যাণ হাসিল করে।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্‌র 'হাক্ব' (হাক্কুল্লাহ্‌) সম্পর্কীয় প্রচলিত ধারণাও স্রষ্টায় মানবীয়তা আরোপমূলক আরেকটি ধারণা, ইহা ইসলামের শিক্ষার বিকৃতি মাত্র। ইসলামে হাক্কুল ইবাদ তথা অপরের প্রতি কর্তব্যের গুরুত্ব বর্ণণাতীত। বিশ্বস্ততার সাথে 'হাক্কুল ইবাদ' পালন ইসলামী সমাজ জীবন-যাপনের অপরিহার্য শর্ত। এ ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ এত দৃঢ় যে, গৃহদ্বারে একটি কুকুরকেও উপবাসী রেখে পূর্ণ আহার গ্রহণ মুসলিমের জন্য জায়েয নয়। নিজের ধন-সম্পত্তি শুধুমাত্র নিজে ভোগ বা নিজের পরিবার-পরিজনের সুখ-ভোগ, আরাম-আয়েশ ও বিলাস সামগ্রীর ব্যয়ে নিয়োজিত না করে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গরিব ও দুঃস্থ মানুষের অভাব-অভিযোগ, রোগ-শোকের কাজে ব্যয় করতে ইসলামে কঠোর নির্দেশ রয়েছে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে যে, যারা ইয়াতীমের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন, যারা ক্ষুধার্তকে অন্নদানে বিমুখ, সে সকল উপাসনাকারী অভিসপ্ত।[১৭]

হাক্কুল্লাহ্‌ ও হাক্কুল্‌ ইবাদ পালনের ব্যাপারে আল্লাহ্‌পাক মানব জাতিকে সতর্ক করে দিয়ে আরো বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূরপ্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।'[১৮] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌পাকের ইবাদতের পাশাপাশি পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গরীব-মিসকিন, অভাবগ্রস্থ প্রতিবেশী, গরীব আত্মীয়-স্বজন সকলের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য সার্বিকভাবে পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি বিশ্ব প্রকৃতি, কুরআন কারীম ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাত আল্লাহ্‌র পালনবাদী নীতির পরিচয় বহন করে। যার চিন্তা, অনুভূতি ও কর্ম আল্লাহ্‌র এই পালনবাদী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাকে রাব্বানী বলা যেতে পারে। কুরআন কারীমে সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 'তোমরা রাব্বানী হও।' ইসলামী শিক্ষা ও জীবন দর্শন শাসন ও শোষণ ভিত্তিক নয় বরং পালন ভিত্তিক। কাজেই যে ভাগ্যবান নিজেকে ও আল্লাহ্‌র অপরাপর সৃষ্ট জীবকে আল্লাহ্‌র পালন

Dhaka University Institutional Repository

নীতি অনুসারে পালন করতে পারে, সে-ই হল রাব্বানী। আর রাব্বানী দৃষ্টিভঙ্গি এ কথাই শিক্ষা দেয় যে, যেকোন অনুভূতি চিন্তা ও কর্ম মানুষের নিজের জন্য অথবা অপরের জন্য ক্ষতিকর তা-ই পাপ এবং যাহা হিতকর বা মঙ্গলজনক তা-ই পূণ্য। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকা এবং পূণ্য কর্মের প্রতি উৎসাহিত হওয়া।

২. আবুযর গিফারী (রা.) এর চিন্তাধারা

হযরত আবুযর গিফারী (রা.) (মৃ.৩১/৩২ হি:) একজন আদর্শ সাহাবী ছিলেন। নবী (স.) এর মুহাব্বত, তাঁর আদর্শ অনুসরণে নিষ্ঠা, সত্য প্রকাশে অকুতোভয় দৃঢ়তা এবং সকল অন্যায়-অত্যাচার মোকাবেলায় তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণধার ব্যক্তিত্ব। তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) ও তাঁর আদর্শকে পরিপূর্ণরূপেই ভালোবেসেছিলেন। তাই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসূলে মকবুল (স.) এর প্রতিটি বাণী এবং আদর্শকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গিয়েছেন। ইসলামের প্রাথমিক সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী বিধি-বিধানের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল জুনদুব ইবন জুনদাহ।[১৯] আবুযর তাঁর উপনাম এবং এ নামেই তিনি অধিক পরিচিত। গিফার গোত্রের লোক হিসেবে তাঁর নামের সাথে গিফারী যুক্ত হয়েছে।

মক্কা নগরী থেকে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে যাবার পথে 'অদ্দান' উপত্যকার পাশে গিফার গোত্র বসবাস করত। গিফার গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ ছিলেন গিফার ইব্‌ন খালীল ইব্‌ন জামীর। কুরাইশ বংশ পঞ্চদশ পুরুষ পূর্বে গিফার গোত্রের সাথে একত্র ছিল। এদিক থেকে আবুযর গিফারী (রা.)-এর বংশধারা রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২০] মক্কার কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা গিফার গোত্রের পাশ দিয়ে সিরিয়া যাতায়াত করত। এসব কাফেলার নিরাপত্তার বিনিময়ে যে অর্থ লাভ করত তা দিয়েই এ গোত্রের লোকজন জীবিকা নির্বাহ করত। কোন বাণিজ্য কাফেলা তাদের দাবী অনুযায়ী অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে তারা এ কাফেলার নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করত না।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম পূর্ব আরবে লুটতরাজ, ডাকাতি, রাহাজানি ছিল খুবই সাধারণ ব্যাপার। সে যুগে গিফার গোত্রের স্বেচ্ছাচারিতা জাহিলী যুগের সাধারণ রীতি-নীতিকেও ছাড়িয়ে যায়। আরবের লোকেরা সে সময় বছরের চারটি মাসকে 'হারাম মাস'[২১] বা নিষেধাজ্ঞার মাস হিসেবে পালন করত। কিন্তু গিফার গোত্র এ হারাম মাসের মর্যাদা লঙ্ঘন করতো বলে আবুযর গিফারী (রা.) তাঁর গোত্রের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। আবুযর গিফারী (রা.) জাহিলী যুগেও একত্ববাদী ছিলেন। তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে উপাস্য স্বীকার করতেন না এবং কোন মূর্তি বা দেব-দেবীর পূজাও করতেন না। ঐ সময়ও তিনি নামায আদায় করতেন।[২২]

আরবের বিখ্যাত গিফার গোত্রের এই দুর্দ্ধর্ষ বীর পরবর্তীতে তাঁর বিবেকের তাড়নায় চিরন্তন মহাসত্যের সন্ধানে ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, গোত্র সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহ্র রাসূলের আদর্শের পানে যথার্থ অর্থে হিজরত করেছিলেন।[২৩] আল্লামা আযাদ সুবহানী রাসূল্লাহ্ (স.) খুলাফায়ে রাশেদা ও ওমর বিন আব্দুল আজিজ (র.) এর শাসনকালকে বিশেষ করে আবুযর (রা.) কে আদর্শ নমুনা হিসাবে অনুকরণীয় মনে করে রাবুবিয়াত বা পালনবাদী দর্শনের সূত্রপাত করেন। আমরা এ প্রসঙ্গে হযরত আবুযর গিফারী (রা.)-কে 'রাবুবিয়াত' দর্শনের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

হযরত আবুযর গিফারী (রা.) ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী পঞ্চম ব্যক্তি[২৪] ও রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর একান্তসচিব। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আবুযরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন ও স্নেহ করতেন। জ্ঞান পিপাসু আবুযর (রা.) কোন কথা জানার প্রয়োজন হলে, যখন তখন রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর খেদমতে আরজী পেশ করতেন এবং যে পর্যন্ত তাঁর পরিপূর্ণ তৃপ্তি না হত, সে পর্যন্ত তিনি প্রশ্ন করেই যেতেন। রাসূল (স.) এই উদ্দাম-দামাল ভক্তের সকল উপদ্রব হাসিমুখেই উপভোগ করতেন। তাই পরবর্তিতে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তাঁর যে কোন কথাই ছিল প্রশ্নাতীত এক মর্যাদার অধিকারী। তাঁর মুখ থেকে যা বের হত তাই ছিল সকলের জন্য একবাক্যে স্বীকার করে নেয়ার মত বিষয়। ইসলামের আলোকে হৃদয় মন আলোকিত করার পর হতে শুরু করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর এই অনন্য মর্যাদা

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষুন্ন ছিল। উম্মতের জন্য উপদেষ্টা-শিক্ষকের মর্যাদা নিয়ে তিনি বেঁচে ছিলেন। ইসলামের যেকোন নীতির স্খলন হলে ক্ষমাহীন কঠোরতার সাথে তার প্রতিবাদ করতেন। তাঁর সেই প্রতিবাদের কণ্ঠ যেমন ছিল বলিষ্ঠ তেমনি ছিল অভিভাবক সুলভ দরদে ভরপুর। এজন্য তাঁর কঠোর সমালোচনার সম্মুখে কোন সাহাবী, তাবেয়ী কিংবা উচ্চ পদস্থ কোন সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি পর্যন্ত মাথা তুলতে সাহস পেত না। এমনকি স্বয়ং খলিফাও তাঁর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।

আবুযর গিফারী (রা.) এর চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক

২.১ সম্পদের মোহ ত্যাগ

দুনিয়ার প্রতি সকল প্রকার আকর্ষণ ত্যাগ করে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র মহব্বতে নিমগ্ন হওয়ার প্রথম ছবক হল ধন-দৌলত তথা ভোগ বিলাসের সকল লিপ্সা পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করা। ইসলামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করার পর মুমিনের অন্তরে দুনিয়ার কোন সম্পদের প্রতিই আর কোন আকর্ষণ অবশিষ্ট থাকেনা। আবুযর গিফারী (রা.) ছিলেন এরূপ ধারণার মূর্তপ্রতীক। রাসূলে মকবুল (স.) তাঁর প্রিয় সাহাবী আবুযর (রা.) কে সর্ব প্রথম যে তালিম দিয়েছিলেন তা ছিল দুনিয়ার সহায় সম্পদের প্রতি পরিপূর্ণ নিরাসক্ত হওয়া। এ সম্পর্কে আবুযর (রা.) নিজেই বর্ণনা করেন:[২৫]

(ক) 'একদিন আমি কাবার দিকে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম, আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) কাবার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন। দূর হতে তাঁর পবিত্র দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ হয়েছিল। নিকটবর্তী হওয়ার পর তিনি আমাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন,–'আবুযর! এই কাবার যিনি প্রভু তাঁর শপথ করে বলছি শোন, ঐ সমস্ত লোক নিশ্চয়ই সর্বনাশের মধ্যে ডুবে রয়েছেন...। আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) উহারা কোন শ্রেণীর লোক? তিনি জবাব দিলেন ' যারা অধিক সম্পদের মালিক হয়েছে। তবে সম্পদ হাতে পেয়ে যারা

Dhaka University Institutional Repository

ডানে বামে মুক্ত হস্তে খরচ করে যায়, তাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু ঐ ধরণের লোক তো খুব কমই হয়ে থাকে।'

(খ) এক বিকালের কথা। রাসূলুল্লাহ্ (স.) একটু ভ্রমণ করার জন্য মদিনার বাহিরে ময়দানে গেলেন এবং সামনেই উহুদ পাহাড় দৃষ্টি-গোচর হচ্ছিল। তিনি আমাকে ডেকে বলতে লাগলেন, 'দেখ আবুযর! এ উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণও যদি আমার হাতে আসে, তবে তা আমি তৃতীয় দিন সকাল পর্যন্ত জমা রাখা পছন্দ করব না। শুধু ঋণ শোধ করার মত কিছু রেখে অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদ এইদিকে সেইদিকে আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিব। যাতে আল্লাহ্র বান্দাগণ সেই সম্পদ দ্বারা উপকৃত হতে পারে।'

(গ) আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, "দেখ আবুযর! আজ এই দুনিয়ায় যারা গরু-ছাগল, মেষ, উট প্রভৃতি সম্পদের মালিক হয়েও যাকাত দেয়না, কেয়ামতের দিন এই সমস্ত পশুই অত্যন্ত ভয়াবহ আকৃতি ধারণ করত: স্ব-স্ব মালিকের উপর এসে আপতিত হবে এবং আঘাতের পর আঘাত করে তাহাদিগকে লাঞ্ছনার একশেষ করে ছাড়বে।"

(ঘ) আমার হাবীব (স.) আমাকে বলেছেন, 'যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে তা আকড়িয়ে ধরে রাখে, ঐ সমস্ত সম্পদ নিঃসন্দেহে তাদের জন্য কেয়ামতের দিন জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হবে।'

(ঙ) আমাকে আমার হাবীব (স.) উপদেশ দিয়েছেন, "আমি যেন মিসকিন সর্বহারাদেরকে ভালবাসতে শিখি এবং সব সময় মিসকিনদের সংগে উঠা বসা করি। সর্বোপরি সব সময় যেন আমি আমার চাইতে সুখী সমৃদ্ধদের প্রতি সচরাচর না তাকাই।"

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে রাসূলুল্লাহ্ (স.) হযরত আবুযরকে এমন দীক্ষায় দীক্ষিত করেছিলেন, যার মূল কথা ছিল দুনিয়ার ভোগ বিলাস এবং সহায় সম্পদ হতে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে আল্লাহ্র

Dhaka University Institutional Repository

সন্তুষ্টিকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে, সর্বক্ষণ তাঁরই ধ্যানে নিমগ্ন থাকার মনোভংগী সৃষ্টি করা।

২.২ ভোগের চেয়ে ত্যাগের প্রতি গুরুত্বারোপ

ভোগের চেয়ে ত্যাগের মধ্যে যে মানসিক শান্তি বেশী, তা অনেকেই স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু বাস্তব জীবনের কঠোরতার মধ্যে অনেকেই শেষ পর্যন্ত সেই মানসিকতা হারিয়ে ফেলতে দেখা যায়। কিন্তু আবুযর গিফারী (রা.) ছিলেন এর ব্যতিক্রম। জীবনের সর্বাবস্থায় তিনি ভোগের চেয়ে ত্যাগের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

হযরত আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত ইসলামের সহজ-সরল জীবন-যাত্রা বিদ্যমান ছিল। ক্রমে ইসলামের বিজয় ও ইসলামী খিলাফতের বিস্তৃতির সাথে ধন ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখা দেয়।

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগেই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিলাসিতা ও সম্পদ সঞ্চয়ের প্রবণতার সূচনা হয়। সাধারণ জনজীবনেও এর কিছুটা প্রভাব পড়ে এবং তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সময়ের সরলতার পরিবর্তে ভোগ ও বিলাসিতার মানসিকতা দেখা দেয়। আবুযর (রা.) মুসলমানদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আমলের সেই সহজ-সরল আড়ম্বরহীন জীবন ধারার অনুসরণ আশা করতেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল সকলেই তাঁর মত ধন-দৌলতের প্রতি নিরাসক্ত থাকুক। তিনি মনে করতেন অন্যকে অভুক্ত ও বস্ত্রহীন রেখে সম্পদ পুঞ্জীভূত করা কোন মুসলমানের পক্ষে বৈধ নয়। তাঁর মতে সম্পদ জমা হয়েই শোষণের পথ প্রশস্ত করে।[২৬] আমীর মু'আবিয়া ও অন্যান্য আমীরগণ মনে করতেন, সম্পদশালী লোকদের উপর আল্লাহ্ যে যাকাত ফরয করেছেন তা সঠিকভাবে আদায় করার পর অতিরিক্ত অর্থ জমা করার সুযোগ মুসলমানদের রয়েছে। কিন্তু আবুযর (রা.) অত্যন্ত নির্ভীকভাবে এ মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিকে তিনি কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতের লক্ষ্যবস্তু বলে মনে করতে থাকেন। "যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তির সংবাদ দাও। যে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। সেদিন বলা তবে এটিই তা যা তোমরা নিজের জন্য পুঞ্জীভূত করেছিলে। সুতরাং আস্বাদ গ্রহণ কর তার যা তোমরা পুঞ্জীভূত করতে।"[২৭]

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'কানয্' এর শাব্দিক অর্থ হলো ঐ গচ্ছিত ও পুঞ্জিভূত সম্পদ যা মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়। পারিভাষিক দিক থেকে 'কানয্' এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় না। দুই ঐ সম্পদ যা অনুৎপাদনশীল খাতে আটকে রাখা হয়। চাই এর যাকাত আদায় হোক বা না হোক।[২৮]

আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে ইয়াহূদী ও নাসারাদের আলোচনা এসেছে। এ কারণে আমীর মু'আবিয়া-এর বক্তব্য ছিল, এ আয়াত তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আর আবুযর (রা.) মনে করেন, আয়াতটির উদ্দেশ্য মুসলিম অমুসলিম সকলেই। আবুযর (রা.) আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করার অর্থ এই বুঝতেন যে, নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন সম্পদ আল্লাহ্র পথে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে না দেয়া। আর আমীর মু'আবিয়া মনে করতেন, এটা শুধু যাকাতের সাথে সম্পৃক্ত।[২৯]

এ অবস্থায় মু'আবিয়া ও উমাইয়া বংশীয় আমীরগণের সাথে হযরত আবুযরের মনের বিরোধ ক্রমে বর্ধিত হয়ে শেষ পর্যন্ত তিক্ততায় পরিণত হয়। তৎসত্ত্বেও আবুযর (রা.) কুরআনের যে সমস্ত আয়াতের মধ্যে সম্পদ পুঞ্জিভূত করার নিন্দা করা হয়েছে বা সম্পদের আসক্তি হতে দূরে থাকতে বলা হয়েছে, হযরত আবুযর সেই সমস্ত আয়াত উদ্ধৃত করে সম্পদশালী লোকদের তিরস্কার করতে থাকেন।

২.৩ মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করা

মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলা, মন খুলে মেলামেশা করাও ইসলামী চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় আমরা সামান্য কারণেই বিরক্ত হয়ে উঠি। দরিদ্র লোকদের সাথে ভালভাবে কথা বলতেও বিরক্তিবোধ করি। হযরত আবুযর ছিলেন এর

Dhaka University Institutional Repository

ব্যতিক্রম। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স.) হযরত আবুযরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যেন সর্বাবস্থায় সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলতে। কারও প্রতি যেন কোন রকম রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ না করতে। হযরত আবুযর বর্ণনা করেন,আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (স.) উপদেশ দিয়েছেন:[৩০]

(ক) "আবুযর! কোন সৎকর্মকেই ক্ষুদ্র বা নিকৃষ্ট মনে করবে না। কোন মুসলমান ভাইয়ের উপকার করার মত সঙ্গতি বা সুযোগ যদি তোমার না থাকে, তবুও অন্ততঃ সেই ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বল। কেননা ইহাও এক প্রকার সৎকর্ম।

(খ) "সাধারণ মানুষের চলাচলের পথ হতে হাড় গোড় উঠিয়ে দূরে নিক্ষেপ করাও একটি সদকার সমতুল্য। কোন পথহারাকে পথ দেখানোও একটি সদকা বিশেষ। কোন অসহায় লোককে সহায়তা করা এমনকি নিজের স্ত্রীর প্রতি সোহাগ বর্ষণ করাও মুমিনের জন্য সদকার সমতুল্য।"

(গ) "আমি যেন যথাসাধ্য আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করার চেষ্টা করে যাই। যদি আমার সামর্থে না কুলায়, তবুও যেন সারাজীবন সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করে যাই।

২.৪ দরবেশী তথা সংযত জীবন যাপন

হুজুর (স.) আবুযরকে একজন পরিপূর্ণ যাহেদ দরবেশ হিসেবে জীবন গড়ার শিক্ষা দিয়েছেন। উত্তরকালে হযরত আবুযরও যুহ্দ ও দরবেশী জীবনের পরিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করে,পরবর্তী উম্মতের জন্য এক আদর্শ দরবেশী জীবনের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি পেশ করেছিলেন। ইসলামে যে দরবেশী জীবনের শিক্ষা, সেখানে স্ত্রী, পুত্র পরিজন পরিত্যাগ করে, সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জীবন অবলম্বন করার অনুমতি নেই। ইসলামে যাহেদ শব্দটির অর্থ সম্পূর্ণ সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করে নয় বরং সংসার ধর্ম পরিপূর্ণভাবে পালন করেই তাঁর সাধনায় পরিপূর্ণতা অর্জন করা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "মনে রেখো, বিবাহ করা আমার আদর্শ। তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপ লোক তারাই যারা বিবাহের প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

উদাসীন থেকে জীবন যাপন করে। সর্বাপেক্ষা জঘন্য সেই সমস্ত লোক যারা অবিবাহিত অবস্থায় জীবন কাটিয়ে মৃত্যু বরণ করে।

হযরত আবযুর (রা.) অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন। তিনি থাকা খাওয়া পোশাক-পরিচ্ছদ এমন কি ঘরের আসবাবপত্রের প্রতিও সামান্য গুরুত্ব দেননি। কঠোর পরিশ্রম করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। অনেক সময় কাজের ফাঁকে যেখানে সেখানে এমনকি প্রকাশ্য রাজপথেও নামাজে দাড়িয়ে যেতেন। এ ব্যাপারে জনৈক তাবেয়ী তাঁকে প্রশ্ন করেন, আপনি রাজপথে নামাজ পড়েন? জবাবে আবুযর বলেন, আমি আমার হাবিব (স.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, দুনিয়ার বুকে সর্ব প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় কোনটি? জবাবে হুজুর (স.) বলেন, "সর্ব প্রথম মসজিদ হচ্ছে কাবা এবং তারপর বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদুল আক্সা। আর আমার উম্মতের জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠকেই সেজদার স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং হে আবুযর! যেখানেই সময় উপস্থিত হয়, সেখানেই নামাজ পড়ে নিও।"[৩১]

হযরত আবুযর পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে ছিলেন খুবই উদাসীন। খাওয়া পরা বা থাকার তাঁর কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিলনা। কোন বিশেষ পোশাকের প্রতি তাঁর কোনই আকর্ষণ ছিলনা। যখন যে ধরণের পোশাক পেতেন, তাই তিনি পরিধান করতেন।

কোন কোন সময় তাঁকে বহু মূল্যবান আরবী আবা পরিহিত অবস্থায় দেখা যেত, আবার কোন কোন সময় মোটা চট পরিহিত অবস্থায় দেখা যেত। আবার কোন সময় ছেঁড়া-ফাটা মিসকিনের বেশে যে কোন স্থানে চলে যেতেন। এতে তাঁর কোন লজ্জাবোধ হতনা, আবার মূল্যবান পোশাক পরিধান করায় তাঁর অন্তরে কোনরূপ অহংকার সৃষ্টি হতনা।

একদা একটি পুরাতন কম্বলে আবৃত অবস্থায় পথে বের হলে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল "এ ছেঁড়া কম্বলটি ছাড়া আপনার কি কোন পোশাক ছিলনা ? তিনি জবাব দিলেন, থাকলে তুমি অবশ্যই উহা আমার পরিধানে দেখতে পেতে। লোকটি বলল, আমি মাত্র দু-

Dhaka University Institutional Repository

তিন দিন আগে আপনার পরণে অতি উত্তম এক জোড়া পোশাক দেখেছি। আবুযর জবাব দিলেন সে কাপড়টা আমি একজন অভাবী লোককে দিয়েছি। লোকটি মন্তব্য করে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ করে বলতে পারি এ দুনিয়ার বুকে আপনার চেয়ে অভাবী আর কোন লোক থাকতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না। হযরত আবুযর জবাব দিলেন, "হতভাগা! আমার শরীরে তো একটি কম্বল রয়েছে, সে লোকটির হয়ত তাও ছিল না।"

তবকাতে ইবনে সাআদের বর্ণনা মোতাবেক হযরত আবুযর অতি সাধারণ একজন স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু জীবনে কোনদিন বসবাস করার মত ঘর নির্মাণ করেননি। পশম নির্মিত তাবুর মধ্যে তিনি বসবাস করতেন। শহরের মধ্যে অবস্থান করার সময়ও তিনি সেই তাবুটিতেই রাত্রি যাপন করতেন।[৩২]

ইসলামী খেলাফতের আমলে আবুযর যে ভাতা পেতেন তা থেকে পরিবার পরিজনের জরুরী খরচ বাদে অবশিষ্ট সব কিছুই তিনি মেহমান, মুসাফির এবং অভাবগ্রস্থদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন।

অনেক সময় এভাবে দান করতে করতে ঘরের যৎ সামান্য সম্বলটুকুও বিলিয়ে দিয়ে নিজে পরিবার পরিজন নিয়ে না খেয়ে রাত্রি যাপন করতেন। পারিবারিক প্রয়োজনে কখনও তিনি কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ সাধনার জীবন ত্যাগ করে সাংসারিক আয় রোজগার বাড়ানোর চেষ্টা করেননি। অভাবের সংসারে অনেক সময় কিছুই থাকত না। এমন অবস্থায়ও আগন্তকদের মেহমানদারী করতে তিনি কখনও পিছু হটতেন না।

স্ত্রীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর, মজযুবী জীবন যাপন করেও তিনি স্ত্রীর সাথে সব সময়ই সদ্ব্যবহার করতেন। সাংসারিক অভাব অনটনের কারণে কোন সময় স্ত্রী বিরক্তি প্রকাশ করলেও তা হাসিমুখে এড়িয়ে যেতেন।

Dhaka University Institutional Repository

২.৫ সম্পদের ব্যবহার

সাধারণভাবে ধনসম্পদ রোজগার করা এবং সমগ্র হক আদায় করার পর তার সঞ্চয় করাকে হযরত আবুযর দোষণীয় মনে করতেন না। যারা ধনের আনুসঙ্গিক হক সম্পর্কে উদাসীন হয়ে শুধুমাত্র পুঁজি বৃদ্ধির পিছনে লেগে থাকে, সেই সমস্ত লোককেই আবুযর পুঁজিবাদী, অপরাধী এবং কুরআনে উল্লেখিত কঠিন আযাবের উপযুক্ত বলে মনে করতেন।[৩৩]

মালের আনুসঙ্গিক হক আদায় করেও তা সোনা-রূপার আকারে জমা করে তার উৎপাদনশীলতার পথ রুদ্ধ করাকে আবুযর অন্যায় বলে মনে করতেন। তাঁর অভিমত ছিল, হালাল পথে অর্জিত ধনসম্পদের সকল হক পরিশোধ করে দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা সোনা-রূপার ন্যায় অনুৎপাদনশীল বস্তুর পিছনে আটক করে রাখা চলবে না বরং যে কোন উৎপাদনমূলক কাজে বিনিয়োগ করে রাখতে হবে, যাতে সকলের পক্ষে পরোক্ষভাবে হলেও সে সম্পদের ফলভোগ করার পথ উন্মুক্ত থাকে।[৩৪] এ প্রসঙ্গে তিনি হুজুর (স.) এর একটি হাদীস উল্লেখ করেন, হে আবুযর আমি যা বলি, তা মনোযোগ সহকারে বুঝবার চেষ্টা কর। একজন মুসলমানের হাতে যদি একটা বকরী আসে, তবে তা ঐ পাহাড় পরিমাণ ধন সম্পদের চেয়ে উত্তম যা মানুষ পুঞ্জিভূত করে দুনিয়াতেই ছেড়ে যায়।

তাঁর মতে, স্বর্ণ রৌপ্য ধন-সম্পদ যারা কুক্ষিগত করে রাখে তাদের মনোভাব হচ্ছে ধন-সম্পদ এককভাবে ভোগ দখল করা, অন্যের নাগালের দূরে রেখে সম্পদের সকল ফায়দা নিজের এবং সন্তানাদির জন্য সংরক্ষিত রাখা। হুজুর (স.) সম্পদের এরূপ ব্যবহার অনুমোদন করেন নাই। সম্পদকে উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহার করার জন্য আবুযর বার বার তাগিদ দিয়েছেন। হযরত আবুযর থেকে বর্ণিত এ হাদীসটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে , রাসূলে খোদা (স.) একবার আবুযরকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমি যা বলছি তা ভালভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর। হে আবুযর ! মনে রেখো অশ্ব সম্পদের ললাটে আল্লাহ্ পাক কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।"

Dhaka University Institutional Repository

উপরের হাদীসে উৎপাদন-বিমুখ উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণের চেয়ে উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত একটি সাধারণ ছাগলশিশু পরিমাণ সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা এবং পরবর্তী হাদীসে অশ্ব সম্পদ অর্থাৎ যুদ্ধ অভিযান এবং বানিজ্যের কাজে সতত ব্যবহৃত অশ্বাদির ললাটে সৌভাগ্যের প্রতীক নির্দেশ করার পিছনে অলস-উৎপাদনবিহীন সম্পদের তুলনায়, উৎপাদনশীল খাতে সম্পদ নিয়োজিত করার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

মোটকথা, সম্পদের পিছনে জীবনপাত করা এবং কেবলমাত্র সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে তোলার বিরুদ্ধে হুজুর (স.) কথা বলেছেন। অপরদিকে উৎপাদনমূলক খাতে সম্পদ ব্যবহার করে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফায়েদা সকল মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য উম্মতের প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। আবুযর গিফারী (রা.)-এর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা প্রসঙ্গে মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ উল্লেখ করেন :

"কুরআন ও সুন্নাহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামী বিধি বিধানের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুটি স্তর বিদ্যমান ; একটি প্রাথমিক বা প্রান্তিক স্তর অপরটি পরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার স্তর। আরবী পরিভাষায় প্রথমটিকে বলা হয় হুদূদে শরীয়ত বা 'রুখছাত' আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় মিযাজে শরীয়ত বা 'আযীমত'। ইসলামের অর্থনৈতিক বিধি বিধান সমূহেও উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যাকাত, উশর ইত্যাদি হল ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রান্তিক ও প্রাথমিক স্তর, হুদূদে শরীয়ত।

এগুলো অস্বীকার করলে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য হয় না। এগুলো স্বীকার করা হল মুসলিম হবার নূন্যতম শর্ত বা প্রান্ত সীমা। কিন্তু এটাই শুধু ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার শেষ লক্ষ্য নয়। এ বিষয়ে মিযাজে শরীয়ত ও ইসলামের পরম লক্ষ্য হল সকলেই প্রয়োজনাতিরিক্ত সবকিছু অপরের কল্যাণ খাতে আল্লাহর মর্জি অনুসারে বিলিয়ে দেবে। এটাকেই 'নেজামে আফও' বলা হয়।[৩৫] প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ মূলত তার নয় বরং অভাবীদের। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

Dhaka University Institutional Repository

"হে নবী! আপনার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে, এরা কি ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন প্রয়োজনাতিরিক্ত সব কিছু।"[৩৬] এটাই হল ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে আযীমত বা পরম লক্ষ্য। ইসলাম মূলতঃ এ চেতনাকেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। মহানবী (স.) জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এ আযীমতেরই অনুসরণ করে গিয়েছেন। এটাই ছিল তাঁর সর্বোত্তম আদর্শ।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবুযর গিফারী (রা.) এর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সাহচর্য্য লাভ করার পর থেকে তিনি যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তা ছিল কঠিন আত্মত্যাগের, দুনিয়ার সকল ভোগ বিলাস পদাঘাত করে আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করার শিক্ষা তিনি হুজুর (স.) এর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন মনে প্রাণে। আর এজন্যই হুজুর (স.) এর বিদায়ের পর থেকে শুরু করে অবশিষ্ট জীবন তিনি তাঁর হাবীবের জীবনাদর্শের একজন অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁর এই জীবন দর্শনের মধ্যেই লুকায়িত ছিল 'রাবুবিয়াত দর্শন'-এর বীজ। একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাঁর জীবন দর্শনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি 'রাবুবিয়াত' বা পালনবাদী নীতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ভোগ করা বৈধ মনে করতেন না। তিনি সম্পদ একা একা ভোগ না করে অন্যকে ভোগের ব্যবস্থা করেছেন, মানুষের সাথে ভাল আচরণ করে তাদের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করেছেন, সম্পদকে অনুৎপাদন ক্ষেত্রে সঞ্চিত রাখার বিরোধীতা করে তিনি তাকে উৎপাদন মূলক খাতে ব্যবহার করার মাধ্যমে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সম্পদ পৌছানোর তাগিদ দিয়েছেন। কাজেই যথার্থ অর্থেই তিনি ছিলেন 'রাবুবিয়াত দর্শন'-এর মূল প্রেরণাদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা*, অনু:গোলাম সোবহান সিদ্দিকী,ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, পৃ.৩৮

২. *আল-কুরআন*, ১২:২৩

৩. প্রাগুক্ত. ২৬ :৭৭–৮০

৪. প্রাগুক্ত. ৭৩ : ৯

৫. প্রাগুক্ত. ১১ : ৩৪

৬. প্রাগুক্ত. ১৬ : ৫৩ : ৫৪

৭. প্রাগুক্ত. ৯ : ৩১

৮. প্রাগুক্ত. ৩ : ৬৪

৯. প্রাগুক্ত. ১২ : ৪১–৪২

১০. প্রাগুক্ত. ১২ : ৫০।

১১. প্রাগুক্ত. ১০৬ : ৩–৪

১২. প্রাগুক্ত.৩৭ : ৫

১৩. প্রাগুক্ত. ৩৭ :১৮০

১৪. আবুল হাশিম, *রব্বানী দৃষ্টিতে, ঢাকা:* আবুজর গিফারী সোসাইটি, (সন উল্লেখ নেই), পৃ.৬৫–৬৬।

১৫. আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

১৭. *আল-কুরআন*, ১০৭: ২-৫

১৮. *আল-কুরআন*, ৪ :৩৬

১৯. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড,ঢাকা:ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ৩য় মুদ্রণ, ১৯৯৫, পৃ. ৫৩; *The Encyclopedia of Islam* Leiden : E. J. Brill, 1989, vol. A. p. 124

Dhaka University Institutional Repository

২০. সাইয়েদ মানাজির আহসান গিলানী, *হযরত আবুযর গিফারী (রা.)* অনু. এ বি এম কামাল উদ্দিন শামীম, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭, পৃ.১৩

২১. হারাম শব্দের অর্থ সম্মানিত। হারাম মাস চারটি হল-মুহাররম, রজব, যিলক্বদ, যিলহাজ। এ চার মাস যুদ্ধ,হত্যা-খুন,লুটতরাজ থেকে সাধারণভাবে আরবগণ বিরত থাকত। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: "নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহ্‌র বিধান ও গণনার মাস বারটি। তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।" (৯:৩৬)

২২. ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, বৈরুত: তা.বি., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৯

২৩. মুহিউদ্দীন, *বিপ্লবীসাহাবী আবুযর গিফারী (রা.)* ঢাকা: কাওসার পাবলিকেশান্স লি:, ১৯৭৮, পৃ. ১০-১১

২৪. ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা,*সাহাবীদের বিপ্লবী জীবণ*, অনু: মো: আবদুল মোনয়েম, ঢাকা:আদ দা'ওয়াহ গ্রন্থানুবাদ ও গবেষণা কেন্দ্র,২০০৩, ২য় খণ্ড, পৃ.৮৫; ডা: আবদুল মা'বুদ,*আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯

২৫. মুহিউদ্দীন, প্রাগুক্ত. পৃ. ৬০-৬২

২৬. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *ইসলাম ও মানবতাবাদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ.১৫

২৭. *আল-কুরআন*, ৯:৩৪-৩৫

২৮. ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কিলাজী ও ড. হামিদ সাদিক কুনায়বী *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, তা. বি., পৃ.৩৮৫

২৯. Dr. Sm Yusuf, *Hazrat Abu Dharr al- Gifari*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1st Ed. 1969, pp. 12-13)

৩০. উদ্ধৃত, মুহিউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬–৬৮

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. প্রাগুক্ত. পৃ. ১০১

৩৪. প্রাগুক্ত. পৃ. ১০১

৩৫.মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামের অর্থনীতি দর্শন ও হযরত আবুযর গিফারী (রা.)* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২. পৃ.৩

৩৬. *আল কুরআন* ২:২১৯

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লামা আযাদ সুবহানীর চিন্তাধারা

কালের আবর্তনে মুসলিম জাহানে যেসব মনীষীর আগমন ঘটেছে, যারা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে জ্ঞান, মনুষ্যত্ব, বিবেক ও প্রতিভার আলো দ্বারা দেশ, জাতি তথা বিশ্ববাসীকে আলোকিত করেছেন, তাদের মধ্যে আল্লামা আযাদ সুবহানী (১৮৯৬/৯৭–১৯৬৩/৬৪) অন্যতম। সুবিখ্যাত আলিম, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, মুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাবিদ, খিলাফত আন্দোলন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী নেতা আল্লামা আযাদ সুবহানী চিন্তাক্ষেত্রে মৌলিক অবদানের জন্য এক বিরল ব্যক্তিত্ব। এ প্রসংগে আবুল হাশিম বলেন, "যে সকল বিপ্লবীর ভাবধারা মানুষের চিন্তার গতিশীলতা সঞ্চার করে মানুষকে সঞ্জীবিত করে তোলে আল্লামা আযাদ সুবহানী সে ধরণের একজন বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[১]"

১.রাব্বানী দর্শন

আল্লামা আযাদ সুবহানীর চিন্তাধারা রাব্বানী দর্শন নামে পরিচিত। তাঁর মতে এ দর্শন জ্ঞান চর্চার এক দুর্লভ ফল ও আল-কুরআনের শিক্ষার সারমর্ম ও তাৎপর্য।[২] তিনি তাঁর দর্শন প্রচার ও প্রসারের জন্য সুবহানী 'জামা'আত-ই রাব্বানী' বা 'জামা'আত-ই রাব্বানিয়াহ' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। এ সংস্থার সদস্যগণ নিজেদেরকে আল্লাহর প্রতিনিধি মনে করতেন। সুবহানী এ সংস্থার মাধ্যমে হুকুমাতে রাব্বানিয়া প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।[৩] আল্লামা আযাদ সুবহানী মনে করেন, ইসলাম একটি তথাকথিত ধর্ম নয়, বরং একটি সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত সামাজিক বিপ্লব, একটি নিরবিচ্ছিন্ন সামাজিক আন্দোলন যার উদ্দেশ্য পৃথিবী হতে শাসনবাদের উচ্ছেদ ও পালনবাদের প্রতিষ্ঠা। আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর জীবনী অধ্যয়ন করে তিনি এ সত্যে উপনীত হন এবং আজীবন তাঁর বক্তৃতা, আলোচনা ও রচনার মাধ্যমে তিনি ইহার প্রচার করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ইসলামের এই কল্যাণময় বিপ্লব (ইন্‌কিলাব) দুনিয়া হতে শোষণ, জুলুম, দারিদ্র, বৈষম্য ও

Dhaka University Institutional Repository

অশান্তির মূলোচ্ছেদ করে একটি আদর্শ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও প্রকৃত সুখী মানব সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম। তিনি তাঁর বিশ্বাসের প্রচার শুধু স্বদেশের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আমেরিকা সফর করে তিনি ঐ সব দেশেও তাঁর ইনকিলাবের আহ্বান পৌঁছে দিয়েছিলেন। আর এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে তিনি শুধু চিন্তাবিদই ছিলেন না, বরং একজন প্রকৃত বিপ্লবীরূপেও তাঁর চিন্তাকে কার্যে রূপান্তির করার জন্য বিরামহীনভাবে কাজও করেছেন।

আল্লামা আযাদ সুবহানী তাঁর লেখা '*তাযকিরা-ই মুহাম্মদী*' গ্রন্থে প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টির মাধ্যমে মহানবীর মাধ্যমে মদীনার মহাবিপ্লবের গোটা কর্মসূচী, তাঁর সফল প্রয়োগ পদ্ধতি এবং গতিধারাকে গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে বিপ্লবের এ মহান নেতা-হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ঐতিহাসিক সাফল্যের কারণগুলো খুঁজে বের করেন এবং হুকুমাতে রাব্বানীয়া প্রতিষ্ঠার চিত্র তুলে ধরেন।

২. আরবের রাব্বানী বিপ্লব

আরবের বিপ্লব বিশ্বের প্রথম সুশৃংখল ও পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব। অনেকে বলার চেষ্টা করেন ফরাসী বিপ্লব বিশ্বের প্রথম সুশৃংখল ও পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব। তবে ফরাসী বিপ্লব যেমন পূর্ণাঙ্গ ও সুশৃংখল বিপ্লব ছিলনা তেমনি উহা পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবও ছিলনা; কারণ উহা আকস্মিক এবং আতর্কিতে ঘটেছিল। এই বিপ্লবের কোন পূর্ব ঘোষিত সুষ্ঠু কোন কর্মসূচী যেমন ছিলনা, তেমনি কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য কোন নক্শাও প্রণীত হয়নি, এমনকি কোন পথ প্রদর্শকও মনোনীত হয়নি। অপর পক্ষে আরবের বিপ্লবের একটি সুষ্ঠু কর্মসূচী ছিল। ইহা একটি পূর্ণাংগ পরিবর্তন সাধন করেছিল এবং একটি সামগ্রিক সংস্কার শুরু করে তা সম্পন্ন করেছিল। এতে রক্তারক্তি হয়েছিল সামান্য, ফল হয়েছিল গৌরব উজ্জ্বল।[৪]

২.১ রাব্বানী বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

আল্লামা আযাদ সুবহানীর মতে এ বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য সমূহ[৫] নিম্নরূপ :

Dhaka University Institutional Repository

(ক) আরবের বিপ্লব শুরু হয়েছিল একজন যোগ্য পথ প্রদর্শক আল্লাহ্পাকের প্রেরিত রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর দ্বারা। এ বিপ্লব ছিল ক্রমবিকাশমান-শিক্ষা ভিত্তিক। আরবের বিপ্লবের কর্মসূচী নিছক চিন্তা-প্রসূত ছিল না ইহা ইলহামী বিষয়ও ছিল ।

(খ) আরবের বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তালীম বা শিক্ষার উপর। এ বিপ্লব শিক্ষার মাধ্যমে শুরু হয়ে, শিক্ষার মাধ্যমেই অগ্রসর হতে থাকে এবং শিক্ষার মাধ্যমেই শেষ হয়। মাঝে মধ্যে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছে কিন্তু ইহা নাফসানিয়াতের যুদ্ধ ছিল না। ইহা ছিল রাব্বানী যুদ্ধ। কারণ যুদ্ধ যাতে স্থায়ী ভাবে বন্ধ হয়ে যায় এ যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল তাই।

(গ) আরবী বিপ্লবের ভিত্তি ছিল গঠনমূলক; ইহার কর্মসূচী ছিল গঠনমূলক, সমাপ্তিও ছিল গঠনমূলক। ভাঙ্গার দিকটি সব সময়ই ছিল গৌণ। একজন শিক্ষক যেমন ছাত্রের মন্দ স্বভাব দূর করার জন্য মাঝে মাঝে আক্রমণ চালায় ঐ স্বভাব পরিবর্তন করার জন্য। আরবের বিপ্লবের আক্রমণও ছিল অনুরূপ।

(ঘ) এই বিশেষত্বের ফলে বিপ্লব পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই সমগ্র আরব দেশ জাতি, গোত্র নির্বিশেষে এক পূর্ণজাতি বলে প্রতীয়মান হতে থাকে। এর কারণ তাঁরা যখন বিশ্ব বিপ্লবের পথে অগ্রসর হল, তখন তাঁদের সম্মুখে যে জাতিই বাঁধা হয়ে পড়েছে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে উড়ে গেছে।

(ঙ) যেহেতু আরবী বিপ্লবের বিশেষত্ব ছিল 'রাব্বিয়াত', যা কেবল 'রাবুবিয়াত' প্রতিষ্ঠা করে; সে কারণে প্রতি পদক্ষেপেই 'রাবুবিয়াত'ই ছড়িয়ে থাকে এবং 'রাজতন্ত্র'কে করতে থাকে সমাধিস্থ।

(চ) আরবের রাব্বানী বিপ্লব 'রাব্বানিয়াতে'র বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বিশ্বের প্রথম বিপ্লবই নয়, ইহা শেষ বিপ্লবও। কারণ আরবের রাব্বানী বিপ্লবের পর আজ পর্যন্ত বিশ্বে আর কোন

Dhaka University Institutional Repository

রাব্বানী বিপ্লব সংঘটিত হতে দেখা যায়নি। এ বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে রাবুবিয়াতের পত্তন।

(ছ) পূর্বেই বলা হয়েছে আরবের রাব্বানী বিপ্লব কোন বিচ্ছিন্ন বিপ্লব নয়। উহা ছিল পরবর্তী বিপ্লবের অংশ মাত্র। সে কারণে পরবর্তী বিপ্লবই ছিল বিশ্ব রাব্বানী বিপ্লব। এ কারণে আরবের রাব্বানী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরম্পরা ছিন্ন হয় নাই; বরং তা যুক্ত হয়েছে ও তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(জ) আরবের বিপ্লব, পরবর্তী সময়ের জন্য বিপ্লবসমূহের যে ধারা সৃষ্টি করেছিল তা অদ্যাবধি জারি রয়েছে। উহা সে সময় পর্যন্ত নিশ্চয়ই অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত গোটা বিশ্ব বিপ্লবের স্বাদ গ্রহণ এবং ফল ভোগ না করবে। সুতরাং অদ্যাবধি যত বিপ্লব এ বিশ্বে হয়েছে তা সবই আরবের বিপ্লবেরই সন্তান।

(ঝ) একমাত্র আরবের বিপ্লবেরই এই অধিকার রয়েছে এবং ইহা প্রয়োজনীয়ও যে, ইহা পেশাগত এবং অঞ্চলগত সমস্ত বিপ্লবের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করবে, যাতে তা রাব্বানী বিপ্লবে পরিণত হয়, নাফসানী বিপ্লবে নয়।

২.২ আরবের রাব্বানী বিপ্লবের গঠন-কৌশল

তদানীন্তন আরব এবং তদানীন্তন সমগ্র বিশ্ব যে সব বিষয়ের সম্মুখীন হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে বিশ্ব যার সম্মুখীন হতে পারে আরবের রাব্বানী বিপ্লবের ভিত্তি সে সব জরুরী বিষয়ের উপর স্থাপিত হয়েছিল। আল্লামা আযাদ সুবহানীর মতে আরবী বিপ্লবের গঠন কৌশল বুঝবার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো[৬] উপলব্ধি করা দরকার।

(ক) আরবী বিপ্লবের জন্য হীনতাবোধ ও সংকীর্ণ ধারণা বিলুপ্তির যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি প্রয়োজন ছিল উচ্চ মর্যাদা-বোধ ও উচ্চ ধারণার সৃষ্টি; অন্য কথায়, কুসংস্কার উচ্ছেদ

Dhaka University Institutional Repository

করার প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল যুক্তির প্রধান্য প্রতিষ্ঠার। এই প্রয়োজনের প্রথম মৌলিক প্রয়োগ স্থল ধর্ম। ধর্মই মানুষের উপর মৌলিক প্রভাব বিস্তারকারী ধারণা ও ব্যবস্থা। আরবী রাব্বানী বিপ্লবের সময় গোটা বিশ্ব শিরকে নিমজ্জিত ছিল। আজও শিরক যথেষ্ট পরিমাণেই বিদ্যমান আছে। তাঁর কারণ, অদ্যাবধি আরবী বিপ্লব বিশ্ব বিপ্লবে পরিণত হতে পারে নাই। শিরকের ক্ষতির কোন সীমা নেই, তাওহীদেরও উপকার অসীম । শিরকের মূল ক্ষতি হল বাসনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা।ইহা মানুষের গোটা জীবনকেই খেয়াল-খুশি-সর্বস্ব করে ফেলে, ফলে মানুষ পরিণত হয় পশুতে। অন্যদিকে তাওহীদের মৌলিক সুফল হল ধারণার অন্ধ-কূপ হতে মুক্তি এবং যুক্তিবুদ্ধির স্বাধীনতার ঐশ্বর্যমণ্ডিত হওয়া। সুতরাং ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় বিপ্লব সৃষ্টিই ছিল প্রথম আবশ্যকীয় কর্তব্য। ধর্মকে এমন পবিত্র করা প্রয়োজন ছিল যে, তাতে যেন 'শিরকের' গন্ধও না থাকে, আর এমন তাওহীদময় করে তোলা যে উহার সুগন্ধিতে যেন সর্বদিক বিমোহিত হয়, উহা'শিরক' হতে মানুষকে যেন সর্বদা দূরে রাখতে এবং তাওহীদের প্রতি সর্বদাই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

উপরোক্ত প্রয়োজনের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল দর্শনের প্রতি মনোযোগ দান। ধর্মের পরেই দর্শন মানুষের জীবনে অধিক প্রভাবশালী ধারণা ও ব্যবস্থা। সুতরাং দর্শনকেও অবান্তর কল্পনার নিচ্ছিদ্র অন্ধকার হতে যুক্তি-বৃত্তির উজ্জ্বল আলোকে আনয়ন করা ছিল দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কর্তব্য।

উপরোক্ত কর্তব্যের তৃতীয় পর্যায় ছিল তাহ্জীব ও তমুদ্দুনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। ধর্ম ও দর্শনের পর মানুষের উপর গভীর ও ব্যাপক প্রভাবশালী অবস্থা ও ব্যবস্থা হল তাহ্জীব ও তমদ্দুন এবং উহার রীতিনীতি। তমদ্দুন-তাহ্জীব এবং উহার নীতি ও বিধি-ব্যবস্থাকে যে বিষয়টি ভ্রষ্ট করে দেয় তা হল কাহিনী ও রীতি। সুতরাং তৃতীয় প্রয়োজনীয় কর্তব্য হল তমদ্দুন ও তাহ্জীবকে কল্পনার গোলকধাঁধা হতে মুক্ত করে যুক্তি-বৃত্তির প্রশস্ত অঙ্গনে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই কর্তব্য পালনের জন্য কবিত্বে, কাহিনী-রচনায় ও রীতিতে যুক্তির প্রয়োগ করা দরকার। উল্লেখ্য যে, কল্পনার উৎস্ ও যুক্তির হন্তা হল নাফসানিয়াত–যা ধনতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের মূল হতে অংকুরিত হয়ে জীবিকায় অসাম্য এবং

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক বিশৃংখলারূপে প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ে একটি মাত্র প্রতিষেধক হল রাব্বানিয়াত, রাবুবিয়াতের সুধায় যা প্রস্তুত হয়।

কাজেই কল্পনা-প্রবণতার উচ্ছেদ এবং বুদ্ধি-বৃত্তিতে প্রাণ-সঞ্চারের জন্য ধর্ম, দর্শন, তমুদ্দুন-তাহ্জীব, রীতি-নীতি, কবিত্ব ও কাহিনীতে বুদ্ধি-সচেতনতা আনয়ন এবং কল্পনাশ্রিত অতিরঞ্জন দূরীকরণ যেমন কর্তব্য, তেমনি প্রয়োজন ধনতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে, রাবুবিয়াতের পত্তন, নাফসানিয়াতের বিলোপ।

(খ) আরবী বিপ্লবের জন্য এরপর প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তির নিষ্ক্রিয়তা ও বন্ধ্যত্ব দূরীকরণ ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা। তবে উহা 'রাব্বানী' চর্চা হবে নাফসানী চর্চা নহে এবং চিন্তাও হবে 'রাব্বানী' চিন্তা, নাফসানী চিন্তা নহে। উপরে বর্ণিত ক্ষেত্রগুলোই অর্থাৎ ধর্ম, দর্শন, তমদ্দুন-তাহ্জীবই হচ্ছে এ প্রয়োজনের প্রয়োগস্থল।

(গ) অতঃপর মানসিক নৈরাজ্য দূরীকরণ এবং তৎস্থলে ভারসাম্য আনায়ন প্রয়োজন ছিল। মন যখন কেন্দ্রীয় সত্তা ও জীবনের সহিত সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে তখন উহাই নৈরাজ্য; আর কেন্দ্রীয় সত্তা ও জীবনের সহিত যখন মন সম্পর্ক যুক্ত থাকে তাকেই বলে ভারসাম্য। সুতরাং যখন ভারসাম্য থাকবে না তখন ধর্ম ও দর্শনেও ঈমান থাকবে না, আর তমদ্দুন-তাহজীবেও প্রাণ থাকবে না। এই ভারসাম্যও রাব্বানিয়াত ব্যতীত সম্ভব নয়।

(ঘ) বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন ছিল নাফসানী নাফসিয়াত দূরীকরণের এবং তৎস্থলে 'রাব্বানী' নাফসিয়াত প্রতিষ্ঠার। 'রাবুবিয়াতে'র কর্তব্য পালন ব্যতীত নাফসের আকাঙ্ক্ষা পূরণকেই বলা হয় নাফসানী নাফসিয়াত। আর রাবুবিয়াতের কর্তব্যের সাথে নাফসের আকাংখা পূরণকে বলা হয় রাব্বানী নাফসিয়াত।

(ঙ) অতঃপর প্রয়োজন ছিল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের খর্বকরণের এবং সমাজভিত্তিক পদ্ধতির সম্প্রসারণের। তবে নাফসানী সামাজিক পদ্ধতির নহে, কারণ ইহাতো ব্যষ্টিকে পিষে মারে।

Dhaka University Institutional Repository

অথচ ব্যষ্টিরও জীবিত থাকার অধিকার রয়েছে। যেখানে ব্যষ্টির অধিকার নেই সেখানে সমাজ টিকে থাকতে পারেনা। কাজেই রাব্বানী সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন, যা ব্যষ্টিকে পিষে না মেরে পালন করে। তবে রাব্বানিয়াত ব্যতীত রাব্বানী সমাজ গঠন সম্ভব নয়।

(চ) এরপর প্রয়োজন ছিল পরাধীনতার জিল্লতী দূরীকরণের এবং স্বাধীনতার মহান নিয়ামত অর্জনের; কিন্তু রাব্বানী স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, নাফসানী স্বাধীনতা নয়। অধীনতা মানুষকে জিল্লতীতে নিমজ্জিত করে, আর স্বাধীনতা মানুষকে সম্মানের শীর্ষে নিয়ে যায়। তাছাড়া অধীনতা জীবিকা ও সামাজিক জীবনকে সংকীর্ণ করে তোলে,কিন্তু ধর্ম, দর্শন ও তমুদ্দুন-তাহ্জীবকে বিকৃত করে ছেড়ে দেয়। রাব্বানী স্বাধীনতা রাষ্ট্র ও সমাজকে এই সকল দোষক্রটি হতে মুক্ত রাখে এবং শাসনবাদের স্থলে রাবুবিয়াতের দিকে নিয়ে যায়।

(ছ) এরপর প্রয়োজন জাতিকে 'রাব্বানী' তালিম। জাতির দারিদ্র নির্মূল করতে হবে, তবে ইহা নাফসানী পদ্ধতিতে নয়, রব্বানী পদ্ধতিতে। জাতির সামাজিক জীবনও সঠিক পদ্ধতিতে গড়ে তোলা দরকার অর্থাৎ নাফসানী সমাজকে রাব্বানী সমাজে রূপান্তরিত করা দরকার।

২.২.১ রাব্বানী সমাজ গঠনের কর্মসূচী

আল্লামা আযাদ সুবহানী 'নাফসানী' সমাজকে 'রাব্বানী' সমাজে রূপান্তরিত করার জন্য নিম্ন লিখিত কর্মসূচী গুলো গ্রহণ করার কথা বলেছেন ঃ [৭]

(ক) সর্ব প্রথম একটি 'রাব্বানী সংঘ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে; রাব্বানী আন্দোলন দ্বারা উহার পৃষ্ঠ পোষকতা দান করতে হবে,যাতে 'রাব্বানী' সংঘে পরম্পরা ও নিয়মানুবর্তিতা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

(খ) অতঃপর বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে 'রাব্বানী' আহ্বান জারি করতে হবে এবং আহ্বানে রাব্বানীর মাধ্যমে 'রাব্বানিয়া'তের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে। এ আহ্বানের সর্ব প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

দফা হবে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান। সে আহ্বান হবে তাওহীদ জাঁক জমকের সাথে, শিরকী আলোকে নহে।

(গ) অতঃপর ধর্মকে নতুনত্বের দীপ্তিতে পেশ করতে হবে-শরীয়তী মর্যাদায় সম্ভব না হলেও অন্তত পুনরুজ্জীবনত্বের মর্যাদায়। এ আহ্বান, এ দাবির সাথে পেশ করতে হবে যে, আহ্বানের নেতা স্বয়ং ধর্মের বাহক –তিনি কেবল ধর্মের অনুলিপিকারক নহেন।

(ঘ) এরপর ধর্মের জীবিকা ও ইবাদত সংশ্লিষ্ট অংশের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে এই বলে যে, এ অংশ অন্য অংশের ভিত্তি ও মূল। এর পর অপর অংশটিও আসবে। ব্যক্তিগতভাবে কার্যকরীকরণের মাধ্যমে এ আহ্বানকে শক্তিশালীও করতে হবে।

(ঙ) এরপর ধর্মের 'রাব্বানী' চারিত্রিক অংশ সম্মুখে আনায়ন করতে হবে এবং উহার দ্বারা কর্মসমূহের শুদ্ধি বিধান করতে হবে। এ চারিত্রিক অংশের জন্য উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত স্থাপন প্রয়োজন। নেতা স্বয়ং, তাঁর সহচর এবং নেতার পক্ষে আহ্বায়কগণ সকলের ব্যক্তিগত আমলের মাধ্যমেই তা সৃষ্টি সম্ভব।

(চ) অতঃপর ধর্মের সমষ্টিমূলক রাব্বানী দিকটিকে তুলে ধরতে হবে। এ সময় সকল জাতিকেই সমষ্টিগত পদ্ধতির প্রতি আহ্বান জানাতে হবে। তাদেরকে সংঘবদ্ধতায় দীক্ষিত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে।

(ছ) এর পর হস্তে ধারণ করতে হবে রাব্বানী 'সিয়াসত' বা রাজনীতির 'বরবত'। সর্বপ্রথম এ ঘোষণা করতে হবে যে,"হে জাতি! তোমরা রাব্বানী জাতি, নাফসানী জাতি হতে তোমরা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন । উচ্চ বংশোদ্ভূত বলে তোমাদের এ মর্যাদা নয়, বরং এ জন্য যে তোমরা রাব্বানী এবং রাব্বানিয়াতের নিশান-বরদার ! ওঠো সকল নাফসানী জাতিকে রাব্বানী আহ্বান পৌঁছে দাও। এমনকি সে জাতি বা জাতি সমূহের নিকট গমন কর, যে বা

Dhaka University Institutional Repository

যারা নাফসানিয়াতের মাধ্যমে তোমাদেরকে দাস বা অধীন করে রেখেছে। বলো তোমরা আমাদের 'রাব্বানী' আমন্ত্রণ কবুল কর,তা হলে আমরা ও তোমরা এক সমান–পরস্পর ভাই ভাই। কিন্তু যদি প্রত্যাখ্যান কর, তা হলে তোমাদের ভবিষ্যৎ তোমাদের হস্তে; তবে তোমাদের নাফসানিয়াতের একচ্ছত্র শাসন বাতিল করে স্বাধীন হওয়ার অধিকার অবশ্যই আমাদের রয়েছে।

উপরোক্ত মর্মবাণীকে বাস্তবায়িত করা হবে এবং অপরাপর নাফসানী জাতির নিকট আমন্ত্রণ পৌছাতে আহ্বানকারী প্রেরণ করতে হবে।

(জ) রাব্বানী আমন্ত্রণের সাথে প্রারম্ভিক ব্যবস্থাপনাও জুড়ে দেয়া প্রয়োজন। তা হল ইহা একদিকে যেমন 'রাব্বানী' আমন্ত্রনে শৃঙ্খলা বিধান করবে,তেমনি রাব্বানী আমন্ত্রনের প্রভাবে সৃষ্ট রাব্বানী জামায়াত সমূহকেও শাসনগত শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করতে থাকবে। ফলে প্রারম্ভটিই হবে হুকুমাতে রাব্বানীর ভিত্তি-প্রস্তর।

(ঝ) দেশে যখন আমন্ত্রণের কাজটি সাফল্যজনক ভাবে সম্পন্ন হবে, তখন 'রাব্বানী' ব্যবস্থাপনাতে হুকুমাতের পূর্ণরূপ দান করতে হবে। তবে এ হুকুমাত দেশকেন্দ্রিক হুকুমাত হবেনা, হবে বিশ্বকেন্দ্রিক; ইহা নাফসানী হুকুমাত হবেনা হবে 'রাব্বানী' 'হুকুমাত'।

আল্লামা আযাদ সুবহানী রাব্বানী সমাজ প্রতিষ্ঠার যে রূপরেখা তুলে ধরেছেন তা খুবই প্রসংশার দাবীদার। তিনি মুসলিম জাতির মুক্তি ও রাব্বানী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমেই রাব্বানী সংঘ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। এ রাব্বানী সংঘের কাজ হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে রাব্বানিয়াতের আহ্বান জানানো। এ আহ্বান হবে তওহীদ ভিত্তিক ও সম্পূর্ণ শিরক মুক্ত। ধর্মের জীবিকা ও ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ তুলে ধরতে হবে। রাব্বানী চারিত্রিক গুণাগুণ তুলে ধরতে হবে যাতে বিশ্ববাসী ইসলামের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে ছুটে আসে। নাফসানী জাতিসমূহকে রাব্বানী

Dhaka University Institutional Repository

জাতিতে রূপান্তরিত করে সর্বজনীন মানবকল্যাণ গঠনই হবে 'রাবুবিয়াত' দর্শনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

৩. আরবের রাব্বানী বিপ্লবে গৃহীত কর্মসূচী

আল্লামা আযাদ সুবহানী রাব্বানী বিপ্লবের লক্ষ্যে কুরআন, সুন্নাহ্, রাসূল (সঃ) ও সাহাবাদের জিন্দেগীর অনুকরণে বেশকিছু কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, কোন সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার জন্য ব্যাপকতর নীতির সমন্বয়ে যে নীতির খসড়া প্রণীত হয়, উহাকে বলা হয় 'লায়েহা আমল' বা কর্মনীতি। কর্মনীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে শাখা প্রশাখা ও খুঁটিনাটি-গত খসড়া তৈরি করা হয়, তাকে বলা হয় নক্শায়ে তামীল বা প্রয়োগ-বিধি। নিম্নে আল্লামা আযাদ সুবহানী কর্তৃক বর্ণিত প্রয়োগ বিধি সমূহ[৮] তুলে ধরা হল

১. যে ব্যক্তি বিপ্লবের নেতা হতে চান অর্থাৎ যিনি রাব্বানী বিপ্লবের নেতা হবেন, তাকে সর্ব প্রথম উলুহিয়াত অনুসন্ধানে নিমজ্জিত হতে হবে। আল্লাহ্তাআলার সন্ধান লাভ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে সে উলুহিয়াত অনুসন্ধানে নিমজ্জিত থাকতে হবে। এজন্য পরম সত্যের সান্নিধ্য-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ও রহস্য উন্মোচনে ক্ষমতাবান লোকেরা যেভাবে সন্ধান লাভ করেন, তাকেও তেমনি সন্ধান লাভ করতে হবে। পরম সত্য (হাক্কুল ইয়াকীন) সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় লাভ হলেই তিনি কেবল কর্মক্ষেত্রে অবতরণ যোগ্য হবেন।

২. 'হাক্কুল ইয়াকীন' বা 'মারিফাতে ইলাহী' অর্জন করার পর অপর যে বিষয়টি অর্জন করা দরকার তা হল 'ইজনে ইলাহী' বা ইলাহীর অনুমতি। এ অনুমতি ওহীরূপে হোক, কাশ্ফরূপে হোক বা সত্যস্বপ্ন কিংবা মনে প্রেরণা লাভের আকারেই হোক-ইলাহীর অনুমতি ব্যতীত এ পথে অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা, এতে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. নেতাকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পূর্ণ একাগ্রতা অর্জন করতে হবে, অর্থাৎ ঈপ্সিত ব্যতীত সবকিছু হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে এবং ইপ্সিতে পরিপূর্ণভাবে নিমগ্ন হতে হবে। বিপ্লবের নেতার সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, বিপ্লবের সম্পূর্ণ বোঝা একা তাঁরই উপর। এ ব্যাপারে বন্ধু ও

Dhaka University Institutional Repository

সাথীগণ যেমন গণনার মধ্যে নয় তেমনি, সাধারণ শ্রেণীর অনুগামিগণও হিসাবের মধ্যে পড়েনা। স্বয়ং উপরে আল্লাহ্ ব্যতীত সবই তুচ্ছ।

৪. বিপ্লবের নেতাকে বিপ্লবের সূচনার জন্য একটি সুবন্দোবস্তপূর্ণ দিবস নির্ধারিত করতে হবে; এমন সুব্যবস্থা করতে হবে, যেন তিনি মরার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করছেন এবং এ দিবসের পর হতে যুদ্ধ জয় ব্যতীত জিন্দা প্রত্যাবর্তন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর পক্ষে দুটি পথ খোলা আছে জয় না হয় মৃত্যুবরণ করা।

৫. 'বিপ্লব সূচনা দিবস'- এমন উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে করতে হবে যাতে সে দিবসই সমগ্রদেশ বা কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি চমকিয়া উঠে এবং বিপ্লবের নেতা যেন একটা ঝঞ্ঝার ন্যায় গণ্য হতে থাকেন। তাঁর খ্যাতি ও আকর্ষণ যেন এত ব্যাপক হয়ে পড়ে যে,সকলেরই মনে হতে থাকবে, একটা নুতন নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটেছে।

৬. বিপ্লবের আমন্ত্রণ জারি করতে হবে পৃথক পৃথকভাবে ও দলগতভাবে, তবে বিপ্লবের নামে নহে, বরং বিপ্লবের কেন্দ্রীয় সমস্যার নামে। অর্থাৎ এ আমন্ত্রণ ও প্রচার এমন হওয়া উচিৎ নহে 'আমি বিপ্লব সাধন করতে এসেছি–আমার প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত কর। প্রকৃতপক্ষে যে, বিপ্লবের শ্লোগান দ্বারা বিপ্লবের প্রাণ সঞ্চার হয়না, প্রাণ সঞ্চার হয় কার্যের মাধ্যমে ; যে কার্যে স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে।

৭. পৃথক পৃথকভাবে প্রচারের জন্য প্রথতমত সেইসব 'রাব্বানী' ফিতরাত সম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে হবে, যাদের মধ্যে প্রকৃতিগত বিপ্লবী ক্ষমতা অথবা দৃঢ় প্রত্যয় ও সজীব স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে।

৮. উপরোক্ত বিশেষ রাব্বানী ব্যক্তিদিগকে একটি প্রকৃত ও কার্যকরী দলে সংঘবদ্ধ করা দরকার, যা প্রথার প্রতি সামান্যই আনুগত্যশীল হবে, কিন্তু কাজ হবে বেশি। এ সকল

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির মধ্যে এমন দায়িত্ববোধ থাকতে হবে, যেন তাঁরা স্বয়ং নিজদেরকে নেতার সমান দায়িত্বশীল বলে মনে করে এবং সে মত কার্য পরিচালনা করে।

৯. নেতার নিজস্ব বিপ্লবী আহ্বান কার্য সঙ্গীদের আহ্বান কার্য হ'তে পৃথকভাবে অব্যাহত থাকবে। তাহলে একদিকে যেমন মৌলিক শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে কার্যটি গুণগতভাবে অগ্রসর হতে হবে, তেমনি ফলিত শক্তির সাথে সাথে সংখ্যাগত দিক দিয়েও তা অগ্রসর হতে থাকবে।

১০. কর্মের মৌলিক ক্ষেত্রে নেতার পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা আবশ্যক–যদিও 'তা শুরায়ী হাকিমান' অর্থাৎ পরামর্শমূলক কর্তৃত্বও হবে, একচ্ছত্র কর্তৃত্ব নহে। তবে এ পরামর্শমূলক কর্তৃত্ব থাকবে শাখা প্রশাখার ক্ষেত্রে–মূলনীতির ব্যাপারে তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব থাকবে। সুযোগ সুবিধামত এ ক্ষমতাটির বলিষ্ঠ প্রকাশও ঘটাতে হবে।

১১. কর্মের মৌলিক ক্ষেত্র ব্যতীত জীবনের সকল স্তরে নেতা হবেন সকলের সমমর্যাদা সম্পন্ন, এমনকি, তিনি তাদের খাদিম মাত্র, তার এ মনোভাব রক্ষা করে চলতে হবে, যাতে এক ক্ষেত্রের তিক্ততা অন্যক্ষেত্রের ক্ষমতা ও সেবায় মধুময় হয়ে উঠে।

১২. সংস্থার সকলের স্তরে এ কথাটি গ্রথিত করে দিতে হবে যে, সংস্থার প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে দাওয়াত। সুতরাং সংস্থার প্রতিটি ব্যক্তিকে আহ্বান কার্যে নিমগ্ন থাকতে হবে। তাছাড়া বিপ্লবের ডাক নিরবিচ্ছিন্ন ও চিরন্তন ; সে ডাক কখনো ব্যহত হবেনা– কখনো থামবেনা। তবে এই ডাকের জন্য উন্নত পর্যায়ের ব্যক্তিগত সাধনাও প্রয়োজন।

১৩. আহ্বানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও খোদ-সংস্থার জন্য যে ব্যবস্থা প্রণালী প্রস্তুত করা হবে, তাকে স্থায়ীভাবে দুভাগে বিভক্ত করতে হবে। একটি বাতেনী ব্যবস্থা, অপরটি জাহেরী ব্যবস্থা। জাহেরী ব্যবস্থাটি সংস্থার প্রতিটি ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আর বাতেনী

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাটি কেবল সংস্থার সে সকল বিশেষ ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, যারা নেতার ঘনিষ্ঠ সহচর।

১৪. ব্যবস্থাপনাকে এভাবে বিভক্ত করণের ফলে আহ্বান কর্মও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'রকমের ডাকে পরিণত হবে। একটি জাহেরী ডাক, অপরটি বাতেনী ডাক। ব্যবস্থাপনার বাতেনী অংশ বাতেনী ডাকের পৃষ্ঠপোষকতা করবে, ব্যবস্থাপনার জাহেরী অংশ দায়ী থাকবে জাহেরী ডাকের জন্য।

১৫. নেতাকে স্বীয় আন্দোলন, আহ্বান সংগঠন, পরিকল্পনা ও অভীষ্টের সমন্বয়ে এক ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করে তা প্রচার করতে হবে। তিনি কী কী করতে চান তা এ ঘোষণা পত্রে বিবৃত হতে হবে। ঘোষণাপত্রের সার কথা হচ্ছে এই যে, তিনি দেশ ও জাতিকে নতুন জীবন দান করবেন এ নতুন জীবন হবে রাব্বানী জীবন, যা প্রচলিত নাফসানী জীবনের উত্তম দিকগুলোকে সংরক্ষণ করবে এবং মন্দ দিকগুলোকে সমাধিস্থ করবে।

১৬. এ পর্যায়ে নেতা সাধারণ্যে তাঁর দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করবেন। সমষ্টিকে যেমন এ আহ্বান পৌঁছাতে হবে, তেমনি ব্যক্তিকেও। স্বরণযোগ্য যে,আহ্বানের প্রারম্ভ হতে যে বিরোধীতা চলে আসছিল সাধারণ্যে ডাক পৌঁছানোর সংগে সংগে তা তীব্রতর হয়ে উঠবে। বিপ্লবী আন্দোলন মাত্রই বিরোধীতার জন্ম দিয়ে থাকে। সুতরাং পাহাড়ের দৃঢ়তা ও সূর্যের স্থিরতা নিয়ে এর বিরোধিতার মুকাবিলা করতে হবে।

১৭. সহ্যের ব্যাপারে নেতাকে সকলের উর্ধ্বে থাকতে হবে। নেতা সততা ও প্রেমের দীপ্তিমান আলোকপিণ্ড ও উজ্জ্বল সূর্য। প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টায় নেতাকে সকলের আগে থাকতে হবে। তিনি পশ্চাদ্বর্তী হয়েছেন তো প্রতিরক্ষা প্রয়াস বানচাল হয়ে গেল। তবে সহ্য ও প্রতিরক্ষা উভয় ক্ষেত্রে হিকমতের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আকরে ধরতে হবে। একটা বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে,আলোড়ন সৃষ্টি বা খ্যাতি অর্জনই অভীষ্ট নয়, অভীষ্ট হচ্ছে সাফল্য অর্জন।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. সহ্যকে দুটি শাখায় বিভক্ত করতে হবে। প্রথম শাখায় থাকবে স্থৈর্য-ধৈর্য, এমনকি ধ্বংস কিংবা মৃত্যু আসলেও। দ্বিতীয় শাখায় থাকবে শক্তি অর্জনার্থে দেশ ত্যাগ। নেতার পক্ষে প্রথম শাখা গ্রহণ করা উচিৎ নহে। অন্যথায় নেতার বিলুপ্তি ও বিপ্লবের সমাধি রচিত হওয়ার আশংকাই অধিক। তবে যদি বাধ্য হয়ে ইহা গ্রহণ করতে হয় তাতে ক্ষতি নেই।

১৯. দেশ ত্যাগ, যাকে 'হিজরত' বলা হয় তা পলায়ন নয়, বরং পূর্ণ সতর্কতা ও ব্যবস্থাপনার সাথেই হওয়া উচিত। এমন যেন না হয় উঠে দাঁড়ালাম আর যাত্রা করলাম, এরপর সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। হিজরতের আসল উদ্দেশ্য হতে হবে রাব্বানী দাওয়াত মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়া। সেখানে গিয়ে এক মুহূর্ত সময়ও যাতে বিনষ্ট হতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২০. হিজরতে নেতাকে যে কাজটি সর্বাগ্রে করতে হবে তা হল তাঁর উচ্চ চরিত্র-মাহাত্ম্যের অভিব্যক্তি–যাতে বিদেশীরাও নেতার মহত্ত্ব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করে এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে যে,সত্যিকার অর্থে ইনি নেতা বটেন। দ্বিতীয় যে কাজটি তাঁকে সম্পন্ন করতে হবে তা হল এতদিন যে, হুকুমত বা শাসন সংস্থা আভাসরূপে বিদ্যমান ছিল এখন তাকে সুস্পষ্ট ও কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

২১. শাসন-সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হবে দুটি। প্রথমত,সর্বাত্মক প্রাথমিক গঠনমূলক প্রচেষ্টা,যা 'হিজরত' অঞ্চলে ও উহার অধিবাসীদের জীবনে চতুর্দিক হ'তে কল্যাণ পৌছতে আরম্ভ করবে। দ্বিতীয়, বাইরের প্রতিরক্ষা কার্য, যা রাষ্ট্রবিরোধীদের আক্রমনের যথাযোগ্য প্রতুত্তরদানে সক্ষম এবং সাথে সাথে তাদেরকে জয় করতেও সক্ষম।

২২. যদি বিরোধী শক্তি উপদ্রব না করে তা'হলে আহ্বান কার্যকে শিক্ষাদান ও ট্রেনিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে উহার বিস্তার সাধনকে যথেষ্ট মনে করতে হবে, যেন আহ্বানের এ রূপটি আহ্বানের লক্ষ্য বস্তু। রাব্বানী বিপ্লবের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। এ বিপ্লবের কোন

Dhaka University Institutional Repository

দিকই প্রতিশোধ বা রক্তপাতের জন্য উন্মুখ নয়। তবে যদি বিরোধী শক্তি উৎপাত-উপদ্রব করে তবে অনন্যোপায় হয়ে বিরোধী শক্তির প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে এমন নিয়তের সাথে যে, বিরোধী শক্তিকে পরাস্ত করার পর বিরোধীদের কোন শাস্তি প্রদান করা হবেনা যদিও তারা কঠিন শাস্তির যোগ্য হয়।

২৩. যদি যুদ্ধ একান্তই শুরু হয়ে যায় তা'হলে যুদ্ধকে রাব্বানী যুদ্ধে রূপান্তরিত করতে হবে। তবে যুদ্ধ সকল দিক থেকেই রাব্বানিয়াতের পরিপন্থী। তথাপী তাতে রাব্বানী রূপদানের অবকাশ অবশ্যই রয়েছে। যদি সে রূপদান সম্ভব হয় তবে এ যুদ্ধের মধ্যেও রাব্বানিয়াত স্বীয় রূপের আভাসদানে সক্ষম হবে।

২৪. যুদ্ধ হোক বা না হোক, যদি আহ্বান সফল হয় তা'হলে বিপ্লবকে দুটি শাখায় বিভক্ত করতে হবে। প্রথমত,অভ্যন্তর বিষয়ক; দ্বিতীয়ত, বহির্দেশ সম্পর্কিত। অভ্যন্তর বিষয়ক শাখার কার্য হবে দেশে রাব্বানী বিপ্লব শাসন-সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করা এবং এ উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতিকে অন্তত জাহেরী বা বাহ্যিকভাবে রাব্বানী জাতিতে পরিণত করতে পারে এমন সব রাব্বানী আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা জারি করা। বহির্দেশ সম্পর্কিত শাখাটি অন্য দেশসমূহে বিপ্লবের আহ্বান কার্য পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করবে।

২৫. বিপ্লব সফল হলে বিপ্লবের অভ্যন্তরীণ শাখার শেষ কার্য হবে বিপ্লবী কর্ম ব্যবস্থা যাতে স্থায়ী হতে পারে সেজন্য সকল কৌশল প্রয়োগ করা। কারণ দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ এ জগতের রীতিই হল প্রভাতের মনোহারিত্ব মাত্র চারি প্রহর অতিক্রম হবার পর সন্ধ্যার ম্লানিমায় রূপান্তরিত হয়; এক সময়ের উত্তাল তরঙ্গ স্ফীত বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পরমুহূর্তেই মৃতবৎ নিথড়, নিস্তব্ধ ও নিশ্চল হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১ বিপ্লবকে স্থায়িত্ব করার কৌশল

যে সব কৌশল বিপ্লবকে স্থায়িত্ব দান করতে পারে । তা হচ্ছে সংখ্যায় মোটামুটি পাঁচটি[৯] –যথাঃ

ক. এমন এক রাব্বানী মাজাহাব বা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা হবে রাব্বানী বিপ্লবের স্রষ্টা।

খ. এমন এক রাব্বানী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা কখনও শাসন-যন্ত্রের অংশ হবেনা এবং সর্বদা নিয়োজিত থাকবে শাসনতন্ত্র ও জনগণের সংশোধন-কার্যে।

গ. এমন এক রাব্বানী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে, যা আধ্যাত্মিক পদমর্যাদায় শাসন-যন্ত্র অপেক্ষাও উচ্চতর বলে স্বীকৃত হবে এবং সে নেতৃত্বের এখতিয়ার থাকবে শাসনযন্ত্র রদ-বদলের এবং জনগণও থাকবে তাঁর পরিচালনাধীন।

ঘ. সংস্কারকের পদ সৃষ্টি করতে হবে যার অধিকার থাকবে, মতবাদের পুনরুজ্জীবনের। শাসনতন্ত্র ও জনগণকে এ পদ মতবাদের দিকে আকর্ষণ করতে থাকবে এবং মতবাদের মাধ্যমে বিপ্লবকে রাখবে প্রাণবন্ত।

ঙ. ইজতিহাদ বিভাগের প্রতিষ্ঠা। উহা মতবাদের কুল্লিয়াত বা নির্বিশেষ হতে সে সব জুয্ঈয়াত বা বিশেষকে উদ্ধার করতে থাকবে যা বিপ্লবকে রাখবে বলিষ্ঠ।

৪. সামঞ্জস্য বিধান

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এখন দেখাতে হবে যে, হুকুমাতে রাব্বিয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত মুহম্মদ (সঃ) সত্যিই এমন কর্মনীতি বাস্তবে রূপায়ণ করেছেন কিনা।

নীতির দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে এ সত্যটি অনুধাবন করা সম্ভব হবে যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহম্মদ (সঃ) তা বাস্তবায়ন করে গেছেন, এ কারণেই তাঁর জীবনের সাথে উহার সম্পর্ক নিরূপিত হয়েছে। নিম্নে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

১. লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, হযরত মুহম্মদ (সঃ) তত্ত্ব অনুসন্ধানের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিন বৎসর ধরে তিনি হেরা পর্বতে রাব্বানিয়াতের সাধনা করেছেন। তাঁর ন্যায় সুমহান প্রকৃতির অধিকারী মানুষের তিন বৎসর অন্য মানুষের ত্রিশ বৎসরের তুল্য ; বরঞ্চ বলা যায় তাঁর এ তিন বৎসরের মর্যাদা অন্য মানুষের ত্রিশটি জীবনের সমান ; এ সুমহান প্রকৃতির অধিকারী ব্যক্তিতো সাধনা ব্যতীতই এবং বুদ্ধি প্রাপ্তির পূর্বেই ফেরেশতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

কেহ কেহ বলতে পারেন যে, তাঁর এ অনুসন্ধিৎসাময় সাধনার উদ্দেশ্য ছিল নিজস্ব শান্তি ও তৃপ্তি ; কোন সামাজিক আন্দোলন এবং সার্বজনীন কল্যাণের সাথে এর সম্পর্ক কোথায়? এর উত্তরে বলা যায় যে, ফলের দ্বারা যদি বৃক্ষের সত্যিকার পরিচয় মিলে তবে ইহা প্রমাণ করা খুবই সহজ যে, তাঁর এ সাধনা কেবলমাত্র নিজ সন্তুষ্টি ও তৃপ্তির জন্যই ছিল না – বরঞ্চ এর লক্ষ্য ছিল বিশ্বের এবং মানবতারই খিদমত ও কল্যাণসাধন।

প্রশ্ন হতে পারে এ অনুসন্ধিৎসা ও ব্যাপক সাধনার ফল কী হয়েছিল? যিনি এ অনুসন্ধান কাজে রত থেকে ফল লাভ করেছিলেন তাঁর উপর কি বৈরাগ্য প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল? তিনি কি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছিলেন? (অর্থাৎ তিনি কি ফকির বা সাধু হয়ে হুজরা কিংবা জনহীন স্থানে ধ্যানে বসে গিয়েছিলেন, অথবা বনে চলে গিয়েছিলেন?) উত্তরে বলা যায় এমনতো হয়নি বরং তিনি উহার বিপরীতই হয়েছিলেন তিনি যে সাধনা-গুহায় প্রথম সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন সেখান থেকে বের হয়েই তিনি সৃষ্টির সেবা সম্পর্কিত সত্য পরিচায়কের উদ্দেশ্যে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। আর ইহা ছিল সৃষ্টির স্ব-নির্ধারিত সেবাদর্শের পক্ষে অপরিহার্যও। এমতাবস্থায় সত্য পরিচয়ের শর্তটি যখন পূরণ হয়েছে তখন তিনি সৃষ্টির সেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

অতঃপর মুহাম্মদ (স.) যখন সৃষ্টির সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করল তখন তাঁর বিরোধী কেউ অথবা বিরোধী কোন শক্তিই তাঁকে তাঁর কর্মসূচী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি যতক্ষণ না মৃত্যুর অমোঘ হস্ত পরমসত্তার ইঙ্গিতে তাঁকে পৃথক করে দিয়েছে। মহাসত্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষণের আনন্দ, যা ইবাদতের সময় অতুলনীয় উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করত তা তিনি সংযত রাখতেন এবং প্রত্যহ সপ্তদফা তাঁর সাক্ষ্যদান করতেন। অতঃপর রাত্রিতেও তিনি নিদ্রা-সুখকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। তথাপী যতক্ষণ সৃষ্টিলোক জাগ্রত থাকে ততক্ষণ নির্দিষ্ট সালাত ব্যতীত মহাসত্য প্রত্যক্ষণের আনন্দে বিভোর হয়ে সমান্য সময়ের জন্যও সৃষ্টির সেবা হতে বিরত থাকতেন না। তিনি রাত্রির শেষাংশে যখন সৃষ্টি সুপ্তিতে নিমগ্ন হয়ে পড়ত তখনও তিনি সারা দিনের কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও আল্লাহর স্মরণে জাগ্রত থাকতেন। মানুষের মিলনকেন্দ্র তথা মসজিদে সালাতের পরে মানুষের বিভিন্ন খোঁজ-খবর নিতেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। সত্যের অনুসন্ধান ও সত্যোপলব্ধিরূপ এ ফল প্রমাণ করে যে, হুজুর (স.) এর সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল রাবুবিয়াত তথা সৃষ্টিরই বৈপ্লবিক সেবা, ব্যক্তিগত শান-শওকত ও তৃপ্তি নয়।

২. হাকিকত উপলব্ধি ও হাকিকত পরিচায়নের প্রথম পদক্ষেপ অতিক্রমের পর হযরত মুহম্মদ (স.) আপন পরিবার-পরিজনের নিকট ইহা ঘোষণা করে দিলেন যে, 'আমি ইন্‌কিলাবের নেতা–স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত ইন্‌কিলাবের নেতা আমি। আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে ও আদেশে আমি ইন্‌কিলাবী আন্দোলন পরিচালনার জন্য আবির্ভূত হয়েছি। আত্মপূজার স্থবির গতানুগতিক জীবন বর্জন কর এবং সৃষ্টি পালনের ইন্‌কিলাবী জীবনে আমার সংগী হও।' এ মৌলিক ইন্‌কিলাবী ঘোষণায় তিনি সামান্যতমও সংকোচ বা সংশয় প্রকাশ করলেন না। এ ইন্‌কিলাবী ঘোষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এই যে, 'ওহে আমার প্রিয় পরিবার- পরিজন! তোমরা যদি আমার সঙ্গী হতে রাজী থাক তবে সংগী হও অন্যথায় আমিও তোমাদের সংগ ত্যাগ করব।'

একটি ঘটনা থেকেই উপরোক্ত লক্ষ্য ও প্রতিজ্ঞার সত্যতার প্রমাণ মেলে। ঘটনাটি হলঃ হযরত মুহম্মদ (স.) এর যখন এ ধারণা জন্মিল যে তাঁর দুই জামাতা ইন্‌কিলাবী আন্দোলনে যোগদান করতে অসম্মত তখন জামাতাগণ তাঁর চাচাতো ভাই ও অতি প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিনা দ্বিধায় আপন কন্যাদ্বয়ের তালাক নিয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং ইন্‌কিলাব যাদের কাছে প্রিয় ছিল তাদের কাছে সে কন্যাদের বিবাহ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, তাঁর এ আহ্বানে তাঁর পরিবার-পরিজন সাড়া দিয়েছিলেন। পরিবার- পরিজনের নিকট এ ধরণের চরম ও ভয়ংকর ঘোষণা এ কথারই প্রমাণ করে যে, হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর জীবনের একমাত্র ব্রতই ছিল ইন্‌কিলাব।

অতঃপর ইন্‌কিলাবের নেতা স্বীয় কবিলার সর্দারদেরকে পর্বতের নিকট আহ্বান করে ইন্‌কিলাবের এ ঘোষণা করেন স্বয়ং তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র অহী প্রাপ্ত নবী। 'মানব-জগৎ পথ-ভ্রষ্টতা, অজ্ঞতা, শয়তান-পূজা ও শয়তানী কার্যকলাপে নিমজ্জিত। ধ্বংস ও বরবাদী দ্বারা তারা সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। শুধু তাঁর আনুগত্যই মানব-জগতকে বিশৃংখলা ও দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম।'

তাঁর এ ইন্‌কিলাবী ঘোষণা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, এ ঘোষণাকারীর সম্মুখে একটি সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট ইন্‌কিলাবী কর্মনীতি ও ইন্‌কিলাবী কর্মসূচী রয়েছে। অতঃপর হযরত মুহম্মদ (স.) প্রতেকের নিকট আলাদা আলাদাভাবে ইন্‌কিলাব প্রচারে মনোযোগী হন। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই খাস একটি দল ইন্‌কিলাবে শরীক হন এবং সুনির্দিষ্ট জামাতে পরিণত হন।

এ দলটি 'রাব্বানী ইন্‌কিলাবী দল' নামে আখ্যায়িত হয় এ দলভুক্ত প্রত্যেকে দ্বিধা-সংকোচমুক্ত হয়ে আহ্বান কার্য শুরু করে। অর্থাৎ এ দলের প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বয়ং নেতা হতে পৃথক অথচ নেতারই নির্দেশিত পদ্ধতিতে ইন্‌কিলাবের প্রচার কার্য চালাতে লাগলেন। প্রমাণ স্বরূপ হযরত আবুবকর (রা.) প্রায় জনদশেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ইন্‌কিলাবী প্রচার কার্যের মাধ্যমে ইন্‌কিলাবী দলের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এছাড়াও হযরত মুহম্মদ (স.) আরবের প্রসিদ্ধ মেলাসমূহে যোগদান করতে লাগলেন। এসব মেলায় বড় বড় কবিরাও সমবেত হতেন। তৎকালীন আরবে এসব কবিদেরও মর্যাদা ছিল আলিমদের মত, অবশ্য খাঁটি আলিমদের মত নয়। এসব মেলায়

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ইন্‌কিলাবের প্রচার করতে লাগলেন। এভাবে হজ্জের মৌসুমেও আগত ব্যক্তিদের শিবিরে গমণ করে তাদের নিকট ইন্‌কিলাবের প্রচার করতেন।

অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (স.) যখন উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর এ ইন্‌কিলাবী ডাক বসতি এলাকা থেকে প্রান্তর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং জামাতও বড় হয়ে পড়েছে, অত্যাচারও ক্রমশ বেড়ে চলছে, তখন কেন্দ্রে যাতে প্রচারের নাম-নিশানা মুছে না যায় সেজন্য এমন কিছু লোককে কেন্দ্রেই রেখে দিলেন, যাদের শুধু আত্মরক্ষার ক্ষমতাই ছিল। অপরদিকে আনন্দে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারেন এমন কতিপয় সঙ্গীসহ হিজরতের সিদ্ধান্ত নিলেন। এ হিজরত ছিল এ নিয়মে যে, প্রথমে সঙ্গীদিগকে প্রেরণ, অতঃপর নিজে যাত্রা করেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীকে নিয়ে।

শুধু তাই নয়, যে স্থানে হিজরতের সিদ্ধান্ত হল হিজরতের পূর্বে সেখানে ইন্‌কিলাবের ডাক পৌঁছে দেয়া এবং একে দৃঢ়মূল করার কাজটিও তিনি ইতোমধ্যে সম্পন্ন করলেন। যেমন- বারোজন মদীনাবাসীকে হজ্জের দু'টি মওসুমে প্রচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োজিত করলেন, তাঁরা গোপনে প্রচার কার্য পরিচালনা করেন ইন্‌কিলাবী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে থাকেন। আন্দোলনকে তাঁরা যখন আরও শক্তিশালী করতে সমর্থ হলেন, তখন তাঁরা বার্তা পাঠালেন। অতঃপর তিনি জানিয়ে দিবেন নিজের হিজরতের কথা। এর পূর্বেই সংগী ও বন্ধুগণকে যাত্রা শুরু করিয়ে দিলেন। ঠিক এ নিয়মেই হিজরত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর ইহা ছিল ইন্‌কিলাবী কর্মনীতি ও কর্মসূচী অনুযায়ী।

অতঃপর হযরত মুহম্মদ (সঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে সর্ব প্রথম দু'টি কাজ করলেন। প্রথমত, মসজিদ নির্মাণ করে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত দলবদ্ধভাবে আদায় করার ব্যবস্থা করলেন। এ সালাতের পূর্বে ও পরে তিনি সকলের অবস্থা অবহিত হতেন এবং যার যে সমস্যা ছিল তা দূরীভূত করার চেষ্টা করতেন। শুধু তাই নয়, এ মসজিদেই তিনি একটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন, যেখানে তিনি স্বয়ং ইন্‌কিলাবের দারস্ বা পাঠ দিতেন। মসজিদে যারা রীতিমত অবস্থান করতেন, এমন একদল প্রচারকের উপর এ সব পাঠ সংরক্ষণের

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব অর্পিত ছিল যাতে এসব পাঠ নিস্তার লাভ করে এবং সর্বকালে এ থেকে মানুষেরা শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয়ত, প্রতিবেশী ইহুদীরা ছিল সুরক্ষিত দুর্গের অধিপতি, যারা বাস করত বাদশাহী শান-শওকতে তাদের সাথে তিনি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, এমন চুক্তি করেন, যা দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির ফলে মদীনাবাসীদের মনে এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, 'তাদের জন্যও একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে-রাষ্ট্র ইন্‌কিলাবী তো বটেই, রাব্বানীও।' ইহুদীরা বিশ্বাসঘাতকতা না করলে এবং ইন্‌কিলাব-বিরোধীদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হলে এ চুক্তির আরও একটি ফল হত, তা হল বিনা রক্তপাতে ইনকিলাব পূর্ণ হত এবং ইহুদীরা স্বদেশে স্বসম্মানে বসবাস করার সুযোগ লাভ করত। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এরা বিশ্বাস ঘাতকতা করে। পরবর্তীতে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ইহুদীদের সমাজ জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা ছিল পুঁজিবাদী যার ভিত্তি ছিল সুদ্‌খোরী ও কর-আদায়ের উপর নির্ভরশীল। তাই স্বাভাবিক কারণেই ইহুদীরা ইন্‌কিলাবের সাথে যোগ দিতে পারেনি। কেননা, ইন্‌কিলাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদী সমাজ নিশ্চিহ্ন করে 'রাবুবিয়াত'-এর নীতিতে ইন্‌কিলাবী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

উপরোক্ত সমস্ত কার্যাবলীই ইন্‌কিলাবী কর্মনীতি ও কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর হযরত মুহম্মদ (স.) প্রত্যহ ইন্‌কিলাবের শিক্ষা দিতে লাগলেন এমনকি সপ্তাহের বিশেষ দিনেও। এ ধরণের পাঠদান এবং ইন্‌কিলাবী দাওয়াত ইকিলাবী জামাত ও বিরোধীদের মনে এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ইন্‌কিলাব কল্যাণময় এবং এর সাফল্যের মধ্যে লুকায়িত আছে ঐশ্বর্য–সমৃদ্ধির সুবিশাল ভাণ্ডার।

এই ইনকিলাবী প্রচারের সার কথা[১০] ছিল

Dhaka University Institutional Repository

ক. ইনকিলাব সমগ্র দেশে এবং বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে একটি মানুষও উলংগ, গৃহহীন, নিরাশ্রয় এবং অবনত থাকবে না। মোট কথা ঃ দরিদ্র, পরমুখাপেক্ষী বলে কেহ থাকবে না।

খ. সমগ্র দেশ ও সমগ্র বিশ্ব হতে অশান্তির মূল কারণগুলি লোপ পাবে।

গ. সমগ্র দেশ ও সমগ্র বিশ্ব হতে ছোট-বড়র ভেদ মুছে যাবে এবং মানবজাতি মধ্যম একটা জাতিতে পরিণত হবে–যারা খেটে খাবে, কিন্তু সুখে থাকবে।

ঘ. সমগ্র দেশে এবং সমগ্র বিশ্বে 'মুলুকিয়াত' বা শাসনবাদের স্থান দখল করবে 'রাবুবিয়াত' বা পালনবাদ।

ঙ. সমগ্র দেশে এবং সমগ্র বিশ্বে 'রূহানিয়াত' বা আধ্যাত্মিকতা ও 'মা'দ্দিয়াত বা বস্তুবাদের সমন্বয় সাধিত হবে এবং এ নিয়মেই নাফসানিয়াতের স্থলে প্রধান্য লাভ করবে রাব্বানিয়াত। অপরপক্ষে শয়তানিয়াত যেমন দমিত হবে, তেমনি নৈরাজ্যবাদের ঘটবে অবসান।

চ. সমগ্র দেশে এবং সমগ্র বিশ্বে অজ্ঞতার স্থান দখল করবে জ্ঞান আর তাক্‌লিদ বা অন্ধ-অনুসরণের স্থান দখল করবে তাহ্‌কীক বা যুক্তি-বিচার।

ছ. সমগ্র দেশে এবং সমগ্র বিশ্বে নাফ্‌সানী জীবন-পদ্ধতি ও ব্যবস্থাসমূহ ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে তৎস্থলে রাব্বানী ব্যবস্থা ক্রমবিকাশ লাভ করতে থাকবে।

জ. এ ইন্‌কিলাব কখনও মুছে যাবে না, কখনও ব্যাহত হবেনা–আগাতেই থাকবে, কেবল এগিয়েই যাবে। বাঁধা বিঘ্ন সত্ত্বেও তা এগিয়ে চলবে। অবশেষে একদিন ইহা লাভ করবে পরিপূর্ণতা, কেবল তখনই মানবজাতি সম্মুখীন হবে কিয়ামতের। বস্তুত ইহাই হচ্ছে জড়-জগত হতে আধ্যাত্মিক জগতে স্থানান্তরিত হবার চূড়ান্ত মুহূর্ত।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছিল নির্দিষ্ট ইন্‌কিলাবী কর্মনীতি ও কর্মসূচী অনুযায়ী। অতঃপর হজরত মুহম্মদ (সঃ) যখন দেখতে পেলেন যে, যুদ্ধকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যাচ্ছে না, কারণ কেন্দ্র তথা মক্কার ইনকিলাব বিরোধীরা হিজরত অঞ্চল তথা মদীনার উপরও আক্রমণ করতে উদ্যত হচ্ছে, তখন তিনি যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা সত্ত্বেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধে যোগদান করলেন এবং এমন শৌর্য ও আভিজাত্যের সাথে তাতে যোগদান করলেন যা ইন্‌কিলাবের নেতা রাব্বানী ইন্‌কিলাবের নেতা এবং আল্লাহ্‌ কর্তৃক মনোনিত নেতার পক্ষেই শোভনীয়। এ যুদ্ধ প্রস্তুতিও এমন সুব্যবস্থা ও সুশৃংখলার সাথে সম্পন্ন হল যা ছিল পূর্ণ ইন্‌কিলাবী এবং রাব্বানী বিপ্লব-ভিত্তিক–যা পরাস্ত হওয়ার কথা জানেই না এবং বিজয় হওয়ার পর দুরভিসন্ধিকে প্রশ্রয় দেয়না। এ কারণেই 'ইহা' 'মুজিযা' বা অলৌকিকত্ব বলে প্রতীয়মান হতে থাকে। কারণ মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে তিনি গোটা আরবের সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিলেন।

অতঃপর হযরত মুহম্মদ (স.) কতিপয় দেশে একটা চিঠির মাধ্যমে ইন্‌কিলাবী ডাক পৌঁছে দিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ঃ দেশ ও জাতির গণ্ডিতে এ ইন্‌কিলাব সীমাবদ্ধ, এরূপ ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন এবং এর বিশ্বজনীন দিকটি এমন করে উন্মোচিত করা যাতে এর বিশ্বজনীনতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহও না থাকে।

এরপর হযরত মুহম্মদ (স.) যখন দেখলেন কেন্দ্রে যুদ্ধ থেমে গেছে এবং সামান্য কিছু অঞ্চলব্যতীত অবশিষ্ট সকল অঞ্চল বিজিত হয়েছে। হযরত মুহম্মদ (স.) তখন হুকুমাতের প্রকাশ্য ঘোষণা করে দিলেন। কাবা গৃহ হতে মূর্তিসমূহ অপসারণের নির্দেশ দিলেন–যে কাবাগৃহ ছিল নাফসানী ও অংশীবাদীদের হুকুমাতের প্রধান কেন্দ্রস্থল। নতুন হুকুমাত প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই উপরোক্ত নির্দেশটি ঘোষিত হল, আর সংগে সংগে একথাও শুনিয়ে দেয়া হল যে, কাবা কোন অপরাধীকে বাঁচাতে সক্ষম নয়। ইহা এ কথারই প্রকাশ্য ঘোষণা যে নতুন হুকুমাতের সম্পর্ক সে মাকামের সাথে যা কাবা হতে উচ্চতর ; অর্থাৎ উহার সম্পর্ক আল্লাহ্‌র আরশের সাথে, যার আইন অমোঘ, বিশ্বজনীন এবং সর্বব্যাপ্ত, যা কাবায় প্রস্তুত আইনকে স্বীকার করেনা।

অতঃপর হযরত মুহম্মদ (স.) বিজয় দিবসে মাত্র দু'একজন অপরাধী ব্যতীত সমগ্র বিরোধী দলকেই সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দিলেন এবং প্রতিশোধের একটি শব্দ পর্যন্ত কোন সাথীদের মুখ থেকে উচ্চারিত হতে দিলেন না। অথচ তাঁর সাথীদের মধ্যে এমন কেউ বাকী

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন না যার অন্তর বিরোধীদের অত্যাচার ও নিপীড়নে ক্ষত-বিক্ষত হয়নি। এরপর এ রাব্বানী ঘোষণাও তিনি দিলেন যে,'আমি বাদশাহ্ নই, আমি অসহায়া নারীরই পুত্র মাত্র।'

এ কর্মটিও ইন্‌কিলাবী কর্মনীতি ও কর্মসূচীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। অতঃপর সমগ্র আরব যখন বিজিত হল এবং রাব্বানী হুকুমাতের প্রথম অংশ, যার ক্ষেত্র ছিল দেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ তা সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন হজ্জ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা যখন একত্র হল, তখন তিনি সমগ্র শিক্ষার সারগর্ভ ভাষণের মাধ্যমে তাঁদেরকে শুনিয়ে দিলেন। যাতে ইন্‌কিলাবের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, বিধি ব্যবস্থার সনদ একবার নতুন করে বিশ্ববাসী জানতে পারে। সংগে সংগে এ তাগিদও দেয়া হল যে, এ সনদ যারা শ্রবণ করলেন তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল তা অপরের নিকট পৌঁছে দেয়া–যাতে ইনকিলাবের এ সনদ বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়।

এরপর হযরত মুহম্মদ (স.) এর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, নিরবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম, সংগ্রাম এবং অনশন–তদুপরি শ্রমিক, সৈনিক, ধ্যান-তাপস্বীর ন্যায় দিবা রাত্রি কায়িক পরিশ্রমে জীর্ণ-দীর্ণ এ পার্থিব জীবন আর বেশীদিন টিকে থাকবেনা। অধিকন্তু কাশফের মাধ্যমে প্রভুর পক্ষ থেকে তাকে জানিয়ে দেয়া হল যে, 'এখন যদি থাকতে চাও থাক নতুবা চল।' তিনি উত্তরে বললেন, এখন বিদায় গ্রহণই অধিকতর কাম্য, তাছাড়া নমুনা হিসেবে কর্মও সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। কারণ বিশ্বব্যাপী কার্য করার মত এত পরমায়ু পাওয়া সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, তিনি ইন্‌কিলাবের দায়িত্ব এমন একজনের উপর ন্যস্ত করলেন, যিনি ছিলেন ইন্‌কিলাবের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ; তিনিই ছিলেন বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম এবং পুরাতন বন্ধু ; গুরুত্বপূর্ণ কোন সময়ই তিনি রাসূলের সংগ ত্যাগ করেননি।

এছাড়াও তিনি ইন্‌কিলাবে স্থলাধিকারী নেতার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত দল, শূরা বা পরামর্শ সভা থাকার কথা বললেন। এদের মধ্যে একজনের সম্পর্কে তিনি বলেনঃ 'এ আমীনুল উম্মত বা জাতির বিশ্বাসভাজন।' আর একজন সম্পর্কে তিনি বলেনঃ 'হক ছাড়া তাঁহার রসনায় কিছুই উচ্চারিত হয়না এবং শয়তান তাঁকে দেখে ভয় করে।' তৃতীয় জন

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে তিনি বলেন, এ 'শালীনতার প্রতিমূর্তি।' চতুর্থজন সম্পর্কে তিনি বলেনঃ 'এ জ্ঞানের দ্বার ; আমার রক্ত মাংস।' আমি যার মনিব, সেও তাঁর মনিব।' পঞ্চম জন সম্পর্কে তিনি বলেনঃ এ আমার বিশ্বস্ত সংগী।' ষষ্ঠজন সম্পর্কে তিনি বলেনঃ এ আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।' সপ্তম জন সম্পর্কে তিনি বলেনঃ 'এ আমার বন্ধুর বন্ধু।' অষ্টম জন সম্পর্কে তিনি বলেনঃ 'এ পরম সত্যবাদী।' এভাবে ইন্‌কিলাবের নয় জন উৎসর্গিত-প্রাণ সঙ্গীর সমন্বয়ে নেতৃ-পরিষদ গঠন করে তাদের উপরই তিনি ইন্‌কিলাবের সর্বোচ্চ স্তরের নেতৃত্ব ভার অর্পণ করেন।

উপযুক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পাই আল্লামা আযাদ সুবহানী মহানবী (স.) এর নবুয়াত জীবনকে একটি বিপ্লব হিসাবে অভিহিত করে এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বিপ্লবের মর্মকথা হল সার্বজনীন মানবকল্যাণ তথা মনুষ্যত্বের মর্যাদাকে জগতে স্থায়ীরূপ দান করা। তাই দেখা যায়, তাঁর এই বিপ্লবী কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে সমগ্র আরব বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল, দারিদ্রতা দূরীভূত হল, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূরীভূত হল, মানুষ জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হল। এক কথায় সমাজ ও রাষ্ট্র হতে নাফসানী জীবন পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়ে রাব্বানী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. আল্লামা আযাদ সুবহানী, *বিপ্লবী নবী*, অনু. মাওলানা মুজিবুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৪ 'ভূমিকা' আবুল হাশিম পৃ.৫

২. আবুল হাশিম, *ইসলামের মর্মকথা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮১, 'মুখবন্ধ', আযাদ সুবহানী,

৩. *মুসলিম মনীষা*, (সংকলন) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০১, *'আল্লামা আযাদ সুবহানী:কর্ম ও জীবন দর্শন'*, সৈয়দ মুজতবা রিজা আহমদ, পৃ. ২৫২.

৪. আল্লামা আযাদ সুবহানী, প্রাগুক্ত. পৃ. ৮১

৫. আল্লামা আযাদ সুবহানী, প্রাগুক্ত. পৃ. ৮১-৮৪

৬. প্রাগুক্ত. পৃ. ৮৫–৮৮

৭. প্রাগুক্ত. পৃ. ৮৯–৯০

৮. প্রাগুক্ত. পৃ. ৯১–৯৯

৯. প্রাগুক্ত. পৃ. ৯৯

১০. প্রাগুক্ত. পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের চিন্তাবিদদের মধ্যে রাবুবিয়াত দর্শনের অভ্যুদয় ও চর্চা

বাংলাদেশে যে সমস্ত মনীষী তাঁদের লেখনী ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরেছেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আবুল হাশিম, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম প্রমুখ অন্যতম। তাঁরা ইসলামী আদর্শ তথা রাবুবিয়াতের আদর্শ অনুযায়ী সমাজ বিনির্মাণে সচেষ্ট ছিলেন। বর্তমান অধ্যায়ে উক্ত মনীষীরা 'রাবুবিয়াত দর্শন' এর অভ্যুদয় ও চর্চায় যে অবদান রেখেছেন পর্যায়ক্রমে তা আলোচনা করা হবে।

১. মাওলানা ভাসানী

মাওলানা ভাসানী উপমহাদেশের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। গরীব-দুঃখী মেহনতী মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তিই ছিল যার ধ্যান ও জ্ঞান। জগতের ঘটনা প্রবাহকে তিনি নিষ্ক্রিয় দর্শকের মত উপলব্ধি করেন নি। রাজনৈতিক উপায়ে সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে তার বাস্তব ভিত্তি নির্মাণের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি রাজনীতি থেকে জীবনকে কখনও আলাদা করে দেখেন নি। পরাধীন ভারতবর্ষে বৃটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। এর আগে তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসায় ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলন থেকে পাকিস্তান আন্দোলন এবং স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত তিনি শুধুমাত্র একজন নেতাই ছিলেন না নেতৃত্বও দিয়েছেন সফলভাবে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণের পর তিনি দেশ গঠন ও গণমানুষের অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন।

মাওলানা ভাসানী ১৮৮৫ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার ধানগড়া গ্রামে একটি মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পারিবারিক পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত ধর্মীয় মানবতাবাদকে

Dhaka University Institutional Repository

(রাবুবিয়াতকে) তিনি সর্বোচ্চ মূল্য দিতেন এবং ধর্মীয় আচার আনুষ্ঠানিকতা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা মাওলানা ভাসানীকে কখনও স্পর্শ করতে পারে নি। তিনি একজন পীর হয়েও গণমানুষের মুক্তির জন্য সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন কিন্তু মার্কসবাদী ছিলেন না। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমি সাম্যবাদ, লেনিনবাদ এবং মাওবাদ সম্পর্কে কিছু বুঝি না। মার্কসের 'ক্যাপিটাল' বইও আমি পড়িনি, তবে এ কথা ভাল করে বুঝি যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক না খেয়ে থাকে।[১] ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব এবং সম্পদের সুষম ব্যবস্থাপনায় তিনি আস্থাশীল ছিলেন এবং এই আদর্শ নিয়ে গণমানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। জীবনের দীর্ঘ পথে তিনি নানা মত পরিবর্তন করলেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসার মূলশিক্ষা সম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা এবং জনগনের কল্যাণ এই দুই মূলনীতি বিস্মৃত হননি।[২]

১.১ রাজনীতিবিদ ভাসানী

পীর নাসির উদ্দিন বোগদাদীর প্রিয় শিষ্য হিসেবে মাওলানা ভাসানী দেওবন্দে শিক্ষা গ্রহণ কালে তিনি ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী নেতাদের সংস্পর্শে আসেন এবং একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি রাজনীতিবিদ হিসেবে অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতির[৩] নেতাদের সংস্পর্শে আসেন এবং খেলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। কংগ্রেসের কর্মী হিসেবেও তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। পরে তিনি আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন, কিন্তু তিনি মুসলিম লীগ সরকারের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। আওয়ামী মুসলিম লীগ (আওয়ামী লীগ) ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে গণমানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি জননেতায় পরিণত হন। তিনি মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে দক্ষিণ টাঙ্গাইল থেকে ১৯৪৮ সালে ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হয়ে বাজেটের উপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ভাষণ দেন। ব্যবস্থাপক সভায় ভাষণ দানকালে তিনি মুসলিম লীগ সরকারের অসৎ চরিত্র তুলে ধরেন। মুসলিম লীগের নেতারা মাওলানা ভাসানীর এ ধরণের ভাষণ পছন্দ করেনি। পরে তিনি ব্যবস্থাপক সভা থেকে পদত্যাগ করেন।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ভাসানীর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন গণমানুষের কল্যাণ তথা ইসলামের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ওয়াজ মাহফিলে দাঁড়িয়ে মাওলানা মুরিদানের সামনে যেমন আল্লাহর আদেশ নিষেধের ওয়াজ করতেন তেমনি ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে সমকালীন আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার গলদ ও ইসলাম বিরোধী দিকগুলোও তুলে ধরতেন।[৫] চৌদ্দশত বছর আগে সামন্তবাদী যুগে ইসলাম যে অর্থে সামাজিক ব্যবস্থার পত্তন করেছিল, তার আদর্শ, মৌল দর্শন ও লক্ষ্যকে বিংশ শতাব্দীতে পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থায় কিভাবে প্রতিফলিত করা যাবে ? আল্লাহর রাসূল (স.) যে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করেছেন এবং তাঁর বিশ্বস্ত চার খলীফা রাষ্ট্রের হেফাজতকারী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেন, কিভাবে তার বাস্তবায়ন বিংশ শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় করা যাবে, সে সম্পর্কে মাওলানা ভাসানী তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ও ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।[৬]

১.২ পীর হিসেবে ভাসানী

পীর হিসেবেও মাওলানা ভাসানীর খ্যাতি ছিল। বাংলাদেশ ও আসামে তাঁর অসংখ্য মুরিদ ছিল। একজন মজলুম রাজনৈতিক নেতা হলেও তিনি আজীবন ইসলামের নিয়ম-কানুন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেছেন। শাহ নাসিরউদ্দিন বোগদাদীর সংস্পর্শে এসে তিনি ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। শাহ্ সাহেবের প্রধান সাগরেদ হিসেবে মাওলানা ভাসানী বাংলাদেশ ও আসামে ১৭ লাখ মুরিদ লাভ করেন। এই মুরিদদের নিয়ে মাওলানা ভাসানী জীবনে অনেক সম্মেলন করেছেন। মাওলানা ভাসানী পীর হলেও অন্যান্য পীরদের মত শিষ্যদের শুধুমাত্র পরকাল বিষয়ক শিক্ষা দিতেন না। অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তিনি শিষ্যদের পরকাল এবং বাস্তব জগতের সমস্যা সমাধানের শিক্ষা দিতেন। মাওলানা ভাসানীর সাথে ধর্মব্যবসায়ী রাজনৈতিক দলগুলোর কোন সম্পর্ক ছিল না। পীর এবং আলেম হয়েও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি কখনও জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী প্রভৃতি ডানপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের আগে বা পশ্চাতে চলেননি। কিন্তু সে সঙ্গে এ সত্যও উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, চীনা, সোভিয়েত, ট্রটস্কীয় প্রভৃতি কোন স্কুলের মার্কসিস্টও তিনি ছিলেন না।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ ইসলামী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা

মাওলানা ভাসানী জীবনের গভীরতম বেদনাবোধ থেকে উঠে এসেছিলেন। এই জীবন বেদনাই তাঁকে কর্মপ্রেরণা যুগিয়েছে যা তিনি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করেছেন। নিরন্ন মানুষের হাহাকার তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন করার জন্য। সমাজতন্ত্রের কথা বললেও তিনি মার্কসবাদী ছিলেন না। ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই গণমানুষের মুক্তির জন্য তিনি সমাজতন্ত্রের কথা বলতেন এবং নিজের মত করেই বলতেন। তাঁর সমাজতন্ত্র বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ন্যায় ছিল না। ধর্মের সঙ্গে সমাজতন্ত্রকে মিলিয়ে তিনি গণমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। ১৯৭০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি শমশেরনগরে চা শ্রমিকদের সমাবেশে তিনি বলেন, "তাঁর পার্টি জনসাধারণের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ব্যক্তি মালিকানার অবসান ঘটাতে এবং আল্লাহ্‌র মালিকানা কায়েম করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সমাজতন্ত্রই তাঁর পার্টির একমাত্র দাবি বলে তিনি শ্রমিকদের জানান। সমস্ত সম্পদের উপর আল্লাহ্‌র মালিকানা কায়েমের মাধ্যমেই কেবল মাত্র একটি শোষণমুক্ত ও সকলের সমান অধিকার সম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"[৮]

মাওলানা ভাসানী গণমানুষের মন বুঝতেন। মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থা ও মানসিকতার কথা চিন্তা করেই তিনি সমাজতন্ত্রের সাথে ইসলাম শব্দ জুড়ে দিয়েছেন। দেশের বেশীরভাগ মানুষই ইসলাম ধর্মের অনুসারী। দেশের মানুষের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি কোন মতাদর্শের কোন প্রচার করতে চাননি। তাছাড়া সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্রাজ্যবাদের অবস্থানের ফলে সমাজতন্ত্রকে এদেশের মানুষ ধর্মের বিরুদ্ধতার সমান মনে করত। তিনি পশ্চাতপদ সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে গণমানুষের ক্ষমতায়ন করতে চেয়েছেন। মাওলানা ভাসানী তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে সকল প্রকার শোষণের বিলোপের কথা বলেছেন। তাঁর মতে পৃথিবীর সকল ভাল কর্মই ইসলাম থেকে উদ্ভূত।[৯]

মাওলানা ভাসানীর দৃষ্টিতে, ইসলাম একটি প্রগতিশীল জীবন পদ্ধতি। যুগ ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামই পথ নির্দেশ দিতে পারে। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকরা কম্যুনিজম

Dhaka University Institutional Repository

কথাটি শুনলেই ভয় পায়। কম্যুনিজম তো কমন পিপলের কমন ইচ্ছা এবং এ ইচ্ছার কথাতো পৃথিবীতে ইসলামই প্রথম বলেছে। কার্ল মার্কস ও লেলিন ইসলাম থেকেই এ শিক্ষা পেয়েছে। ইসলাম পৃথিবীতে মানব জাতির আশির্বাদ স্বরূপ এসেছিল বলেই কার্ল মর্কস, লেলিন ও মাওসেতুং একথা বলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা কমন পিপলের কল্যাণের কথা বলেছেন। মানুষ হিসেবে সবাই সমান। এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে মানুষ হিসেবে সকলেরই সমান অধিকার সংরক্ষিত হবে। কোন ব্যক্তির গায়ের জোরে, ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, খেয়াল খুশিমত রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারিত হবে না। সমষ্টির মতামতই শেষ কথা। এ জন্যই তিনি ইসলামী কম্যুনিজমের কথা বলেন। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের শোষক শাসক গোষ্ঠী কম্যুনিজমকে ভয় পায়। কিন্তু তাঁরা ধর্মের দোহাই দিয়ে কম্যুনিজমকে বিকৃতভাবে প্রচার করে থাকে। তারা বলে, কম্যুনিজম মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তরায়। কম্যুনিজম ব্যক্তি মতামতের কোন মূল্য দেয় না। কিন্তু আমি বলি, "প্রত্যেক মানুষ যদি পেট পুরে খেতে পায়, পরনের কাপড় পায়, অসুখের চিকিৎসা পায়, সহজেই শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়, তাহলে কথা বলার প্রয়োজন কি ? মানুষের মৌলিক প্রয়োজন যদি মিটে যায় তবে তার অসন্তোষ প্রকাশের সুযোগ কোথায় ? একজন মানুষ খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারলেই তো সে তার স্রষ্টা আল্লাহর কথা ভাববার অবকাশ পাবে। পরকালের কাজেও উদ্যোগী হবে। আর যদি একজন মানুষ দিনের পর দিন না খেয়ে থাকে, এক ফালি কাপড় বিনে উলঙ্গ থাকে, শিক্ষা লাভের সুযোগ না পায় তাহলে তার মধ্যে ভাল মন্দ বিচার আসবে কি করে ? এজন্যই আগে ভাত চাই এবং এটাই হলো আমার ইসলামী কম্যুনিজম।"[১০]

১.৪ হুকুমাত-ই রাব্বানি প্রতিষ্ঠা

তরুণ বয়স হতেই মাওলানা ভাসানী ইসলামকে একটি সাম্যবাদী শোষণ ও জুলুম বিরোধী সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা হিসেবে বিশ্বাস করতেন। সর্বহারাদের মুক্তির সংগ্রামে মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলোর নিস্পৃহতার দরুন তিনি বামপন্থীদেরকে সংগঠিত করে সংগ্রাম পরিচালনা করেন। বামপন্থীগণ ব্যর্থ হলে তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে রাব্বানী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য ১৯৭৪ সালে হুকুমাত-ই রাব্বানীয়া সমিতি গঠন করেন।[১১] হুকুমাত-ই রাব্বানীয়া সমিতি প্রতিষ্ঠার পূর্বকথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ মাওলানা সুবহানী

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, রাজনীতিতে যত কলা-কৌশলই অবলম্বন করুন না কেন, হুকুমতে রাব্বানীয়া কায়েমের জন্য তিনি সংগ্রাম করে যাবেন। তাঁর মনে পড়ে ১৯৩৫ সালে আমরূহাতে ১৭ জন আলিম রাজনীতিবিদদের সিদ্ধান্তের কথা ; মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা হযরত মোহানী, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী প্রমুখের সাথে তাঁর যোগাযোগ ও ওয়াদার কথা। মাওলানা ভাসানী এ প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে কোনরূপ ইতস্ততঃ না করেই সুবহানীকে বললেন ঃ হ্যাঁ, ওয়াদা করলাম, রাজনীতিতে যা কিছুই করি, হুকুমাত-ই রাব্বানীয়া হতে লক্ষ্যচ্যুত হব না।[১২]

অতঃপর ভাসানী আরো বলেন, "দীর্ঘ ২৭টি বছর কেটে গেছে। আজ আমি ব্যাখ্যা করে বলতে চাই না কিভাবে আমি ধাপে ধাপে হুকুমাতে রাব্বানীয়া কায়েমের পথে চলে এসেছি। অন্তঃদৃষ্টিসম্পন্ন কোন ভাষ্যকার যদি আবিষ্কার করতে পারেন, তবে দেখবেন ১৯২১ সাল হতেই আমি এ পথ ধরেছি। কখনো কোথাও আমি কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছি। কোথাও আবার নেতৃত্ব দান করেছি। আজ আমি পরিষ্কার ভঙ্গিমায় শুরু করেছি হুকুমাতে রাব্বীনয়া কায়েমের প্রস্তুতি। গত ৮ এপ্রিল (১৯৭৪) সন্তোষে হুকুমাত-ই রাব্বানীয়া সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছি।[১৩]

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, এতদিন পর কেন তিনি এ দর্শন প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন। এর জবাবে তিনি বলেন : সব কথা ও কাজের একটি মৌসুম আছে। যদি মৌসুম মাফিক মানুষের নিকট পেশ করা না হয়, তবে অতীব কল্যাণময় বিষয়ও অর্থহীন এবং গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এখন বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান করার সময় হয়েছে। তাই তিনি হুকুমাত-ই রাব্বানিয়া প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদেরকে আহ্বান জানান।

১.৫ হুকুমাত-ই রাব্বানিয়া সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

হুকুমাত-ই রাব্বানিয়া সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে মাওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন : "হুকুমাত-ই রাব্বানিয়ার মূলকথা আল্লাহ্র দোস্ত আমাদের দোস্ত, আল্লাহর দুশমন আমাদের দুশমন। এই সমিতি সমাজতন্ত্রবাদীদের মত কেবল লা ইলাহা-ই কায়েম করবে

Dhaka University Institutional Repository

না। সেখানে ইল্লাল্লাহ্‌র বীজও বপন করবে। আমাদের কোন কাজে আত্মতুষ্টি অর্থাৎ নাফসানিয়ত থাকবে না...। এই সমিতি যেমন হাক্কুল্লাহ আদায় করবে ঠিক তেমনি হাক্কুল ইবাদও করে যাবে।... তাই এই সমিতি মানুষের যেমন বৈষয়িক উন্নতি ঘটাবে সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আত্মিক শক্তির বিকাশও ঘটাবে। আল্লাহ্ 'রাব' গুণে গুণান্বিত হয়ে শুধু সৃষ্টি করে যাচ্ছেন না। সবকিছুকেই বিশেষ উদ্দেশ্যে লালন পালন করছেন। স্রষ্টার এই পালনবাদের আদর্শই হল 'রাবুবিয়াত'। সকল কর্মসূচী ও পরিকল্পনায় রাবুবিয়াত'-এর আদর্শ যে রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা হবে তা-ই হুকুমাত-ই রাব্বানিয়া। সেই রাষ্ট্রে থাকবে স্রষ্টার পালনবাদ–মানুষের শাসনবাদ নয়।"[১৪]

১.৬ হুকুমাত-ই রাব্বানিয়া সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা

হুকুমাত-ই রাব্বানিয়া সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মাওলানা ভাসানী বলেন:

প্রথমত: "নানা মতবাদ, নানা পন্থা মানুষকে নতুন নতুন শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলেছে। শ্রেণীহীন সমাজের কথা ভাবতে গিয়ে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ও হিংস্র হয়ে পড়েছে তাঁর বিশ্বাস, একমাত্র রাবুবিয়াতের দর্শনই জাতি-ধর্ম-মতবাদ নির্বিশেষে শান্তি দিতে পারে। তাই তিনি দুনিয়া হতে অশান্তি দূর করার বাস্তব কর্মসূচী পেশ করতে হুকুমাত-ই রাব্বানিয়া সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছেন।"[১৫]

দ্বিতীয়ত : "আজকের দুনিয়ায় রাজনৈতিক সকল মতবাদ মানুষের নিজস্ব শাসন আরোপ করেছে। তা এক কথায় হয়েছে নাফসানিয়াত, যার কারণে প্রকৃতপক্ষে পালনবাদের স্থলে কায়েম হয়েছে শাসনবাদ। তাই দেখা যায়, ধনবাদীই হোক আর সমাজবাদীই হোক, কোন ব্লকের মানুষই সুখী হতে পারেনি, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়নি। ধনবাদী ও সমাজবাদী সমাজ মানুষকে অতিষ্ট করে তুলেছে। কাজেই একমাত্র রাবুবিয়াতের আদর্শই মানুষে মানুষে শাসন, শোষণ ও হানাহানি বন্ধ করে মানবজাতিকে সুখী করতে পারে।"[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

১.৭ কমিউনিষ্ট ও দক্ষিণপন্থী আলেমদের সাথে তাঁর মতের পার্থক্য

মাওলানা ভাসানী যখন হুকুমাত-ই রাব্বানিয়ার কথা বলেন, তখন কমিউনিস্টদের সাথে দক্ষিণপন্থী এক শ্রেণীর আলিমও এর বিরোধিতা করেন। তিনি মনে করেন সকল সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্‌র, মানুষ তার আমানতদার মাত্র। তাই আল্লাহ্‌র নামে রাষ্ট্রের সকল সম্পদ প্রয়োজনের ভিত্তিতে সমানুপাতিক হারে বণ্টন করে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করতে হবে। কমিউনিষ্টরা ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ কামনা করে বটে ; কিন্তু তাদের মতে তা আল্লাহ্‌র নামে না হয়ে রাষ্ট্রের নামে হতে হবে। আলিমরা সবকিছুতে আল্লাহ্‌র মালিকানা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ কামনা করেন না।[১৭]

কমিউনিস্টরা অদৃশ্য ও ভাবমূলক জীবনবোধের ধার ধারে না। তাই তারা মানুষের সামগ্রিক চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। আল্লাহ্‌র নামে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করলে যেমন পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসবে, তেমনি আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরও একটি যোগসূত্র কায়েম থাকবে। আফসোসের বিষয়, এক শ্রেণীর 'আলিম এটা মেনে নিতে চান না। হুকুমাত-ই রাব্বানিয়ার কথা বললে তারা নাখোশ হয়ে ওঠেন।[১৮]

১.৮ হুকুমাতে রাব্বানিয়া প্রতিষ্ঠার গৃহীত পদক্ষেপ

১. সম্পদ জাতীয়করণ করা

হুকুমাত-ই রাব্বানির প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মাওলানা ভাসানী বলেন, কমিউনিস্টদের মতো রাষ্ট্রের নামে নয় ; বরং আলআমীনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সকল সম্পদ জাতীয়করণ করে হুকুমাত-ই রাব্বানিয়া কায়েমের প্রথম পদক্ষেপ সম্পন্ন করতে হবে। হুকুমাত-ই রাব্বানিয়া কায়েম হলে সবাই হবে 'রাব্বানী বান্দা'। 'রাব্বানী বান্দার' কোন পকেট থাকবে না যে সঞ্চয় করবে। তবে হতাশ হবার কিছু নেই। আমাদের কাছে 'রাবুবিয়াত' এর আদর্শ আমানতস্বরূপ রয়েছে। উহার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠাই সকল সমস্যার সমাধান করে দেবে ইনশাআল্লাহ্‌।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

২. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

পুঁজিবাদের ধারক বাহক ঔপনিবেশিকতাবাদী ও সম্রাজ্যবাদীরা এ দেশে শাসন শোষণ অব্যাহত রাখা ও কেরানীকুল সৃষ্টি করার জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল এ দেশের মানুষ অন্ধভাবে সেই শিক্ষা নীতিই অনুসরণ করে চলছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম ও নৈতিকতার কোন স্থান নেই। ধর্ম শিক্ষার নামে জীবনের সাথে সম্পর্ক বিহীন তথাকথিত মাদ্রাসা শিক্ষা প্রবর্তন করে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় সুকৌশলে আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মানো হয়েছে। তাই মাওলানা ভাসানী ইসলামী তথা রাবুবিয়াতের আদর্শ স্থাপনের জন্য একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। তিনি মনে করেন, মানুষ আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধি, এ সত্যে যিনি বিশ্বাসী তিনি শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি সত্ত্বেও মানুষের নৈতিক অবনতি লক্ষ্য করে ব্যাথিত ও চিন্তিত না হয়ে পারেন না। তাই মানবিক মর্যাদা নিয়ে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংকট মুহূর্তে বাঁচতে হলে শিক্ষাকে সকল পরিকল্পনার উর্ধ্বে ইসলামী জীবনবোধের দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা জাতি রাজনৈতিক মুক্তি পেয়েও মানসিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এ গ্লানিময় পরিস্থিতিতে শিক্ষা বিপ্লব ছাড়া মুক্তির বিকল্প কোন পথ নেই।

তার মতে, "ইসলামের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনি নিরক্ষর কিংবা অশিক্ষিত হলেও যুগের দাবীকে উপেক্ষা করে লক্ষ্যে পৌছার সব রকম পন্থা চিনে নিতে পারেন। কিন্তু আপন সমাজকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে দুনিয়ার অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং সর্বপরি ইতিহাসের যে কোন চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে মানব জাতির জন্য শাশ্বত কল্যাণস্বরূপ স্বীয় ধারাকে প্রবাহমান করে রাখতে ভাবগত ও বিষয়গত সর্বোত্তম শিক্ষা অর্জনের সুযোগ থাকা দরকার। তা-ই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা।" মাওলানা ভাসানী তাঁর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ধর্মের মানুষের প্রবেশ সিদ্ধ করেন। সকল মানুষ মিলেই সমাজ। সকল ধর্মের, সকল দেশের মানুষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারবে এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই বিশ্ব প্রেমের মধ্য দিয়েই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৯ হাক্কুলাহ্ ও হাক্কুল ইবাদ সম্পর্কে অভিমত

মাওলানা ভাসানী ১৯৭৬ সালের ২ অক্টোবর খোদায়ী খিদমতগার নামে একটি নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল তাঁর জীবনের শেষ অরাজনৈতিজক অথচ বিপ্লবী সংগঠন। মৃত্যুর ৪ দিন পূর্বে ১৩ নভেম্বর সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শুরু হয় এ সংগঠনের সম্মেলন। এ সমাবেশে তিনি তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ পেশ করেন তা ছিল নানা কারণে ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ। এ সমাবেশে মাওলানা ভাসানী বলেন, 'আমার বিগত ৭৫ বৎসরের রাজনৈতিক জীবনে ক্ষমতার হাতবদল কখনও বা অতি নিকট হতে বা কিঞ্চিত দূর হতে অবলোকন করেছি। এই পর্যায়ক্রমিক পট পরিবর্তনের ধারায় আমি নিজেও সাধ্যমত সক্রিয়তা বজায় রেখেছি। কিন্তু যে কৃষক, মজদুর, কামার, কুমার, জেলে, তাতী, মেথর, প্রভৃতি মেহনতি মানুষের মুক্তির স্বপ্ন আবাল্য দেখেছি ও যে জন্য সংগ্রাম করেছি, তা আজও সুদূর পরাহত। তাই আমার সংগ্রামের শেষ হয়নি। এই সংগ্রাম আজীবন চলবে। আমার মৃত্যুর পর এই সংগ্রামের উত্তরাধিকার তাদের উপর বর্তাবে যারা এক আল্লাহকে প্রভু জেনে এবং তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে খেদমতে খাল্ক অর্থাৎ মানবজাতি তথা সমগ্র সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়ে খোদায়ী খিদমতগাররা জাতি- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে। মদীনার নবীর আসহাবে সুফফার জীবনই হবে তাদের আদর্শ। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও জাগতিক দেনা-পাওনাকে তারা এড়িয়ে চলবে ঘৃণা ভরে। মানুষের শাসনবাদকে উৎখাত করে আল্লাহ্র শাসনবাদ কায়েম করাই হবে খোদায়ী খিদমাতগারদের লক্ষ্য। ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিক ক্ষমতার রাজনীতি তারা সর্বাবস্থায় পরিহার করে চলবে। সেবা ও সংগ্রামের পথই খোদায়ী খিদমাতগারদের পথ। হাক্কুল ইবাদ আদায় করাই হবে তাদের সকল কর্ম প্রয়াসের মূলমন্ত্র এবং এটিই হবে আমার রাজনীতিসহ সকল কর্মকান্ডের ভিত্তিমূল।'[২১]

একথা মনে করা ঠিক নয় যে, ১৯৭৬ সালের ১৩ নভেম্বর ভাষণেই মাওলানা ভাসানী প্রথম 'হাক্কুল ইবাদ' এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। সারা জীবন ধরেই তিনি হাক্কুল ইবাদ অর্থাৎ মানুষের হক বা অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন। মাওলানা ভাসানী তাঁর ভাষণে আরও বলেন, "বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও তেমন আশাব্যঞ্জক নয়,

Dhaka University Institutional Repository

সারা দুনিয়া আজ কতিপয় পরস্পরবিরোধী জোটে বিভক্ত। ফলে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতার গর্বিত মানুষ পরস্পরকে নিধনের মতলবে বিরামহীন মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত এরই পরিণতিতে সমগ্র পৃথিবী একটি মারাত্মক অস্ত্রাগারে পরিণত হতে চলছে। ছোট-বড়, গরীব-ধনী, -সকল রাষ্ট্রই এই আত্মঘাতী মাতলামীতে নিমগ্ন।[২২]

তিনি মনে করেন, আজও বিশ্বের প্রায় তিন চতুর্থাংশ যে মানুষ নিদারুণ দারিদ্র কবলিত; এই বিশ্বগ্রাসী সমস্যা ও সংকটের মূল উৎস সম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ। এগুলো পরিহার করে সকলে সার্বজনীন কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবী হতে দুঃখ-দারিদ্র মুছে ফেলা যাবে কিন্তু এই আশা ততদিন পর্যন্ত দুরাশাই থেকে যাবে যতদিন না মানবজাতি এক আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব এবং দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার স্বীকার করে নিবে। তাঁর মতে, পারস্পরিক পালনবাদী সম্পর্কই হবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভিত্তি। এরই নাম রাব্বানী আন্তর্জাতিকতাবাদ। এই দিক হতে নবজাগ্রত মুসলিম বিশ্বের সবিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করায়ে তাদেরকে তৃতীয় বিশ্বের মুক্তির অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদেরকে হতে হবে রাব্বানী আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারক ও বাহক। আন্তর্জাতিক পরিসরে এই আদর্শের প্রচার ও প্রসার সাধন করাই খোদায়ী খিদমতগারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।[২৩]

মাওলানা ভাসানীর কর্মময় জীবন অন্য আট দশ আলেমের মত ছিল না। তাই দেশের হাক্কানী আলেম সমাজের অনেকেই তাঁকে পছন্দ করতেন না। তার কারণ হল একদিকে তিনি যেমন- স্বাভাবিক ইবাদত বন্দেগী ও সাধ্যমত ইসলাম প্রচারের মধ্যে আপন কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ না রেখে ইসলামী দর্শন ভিত্তিক রাজনীতির প্রচার করতেন। অন্যদিকে তিনি সব সময়ই নাস্তিক, কম্যুনিষ্টদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। আলেমদের প্রশ্ন ছিল, যে মাওলানা এমন প্রকৃতির তিনি কেমন করে রাসূলুল্লাহ (স.) এর খাঁটি উম্মত হতে পারেন ? এ প্রসঙ্গে মাওলানা এক সময় ইসলামী চিন্তাবিদ মনীষী আল্লামা আবুল হাশিমের সঙ্গে এক ঘরোয়া আলাপে প্রসঙ্গক্রমে বলেন, 'আচ্ছা ঘরে যখন আগুন লাগে তখন পানির বালতি নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দৌড়ানোই কি অধিকতর জরুরী কর্তব্য নয় ? একমুঠো ভাতের অভাবে যখন দেশের মা বোনের ইজ্জত রাস্তাঘাটে বিলিয়ে যাচ্ছে, কাফনের কাপড়ের অভাবে কলা পাতায় ঢেকে যখন দাফন করা হচ্ছে কৃষক মজুরের লাশ, তখনও যারা জেহাদে না নেমে ঘরে বসে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করছেন তাদের বাদ দিয়ে যারা দৃশ্যত আল্লাহ্ মানে না অথচ জেহাদ করতে চায়, আমি যদি তাদের সঙ্গেই থাকি তাহলে কি অন্যায় হয়? অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদকারীর জাত বিচার করব আমি কি এতই মূঢ়?'[২৪]

মাওলানা ভাসানী দেশী-বিদেশী সকল শোষণ থেকে কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর আদর্শ ছিল হাক্কুল ইবাদ। হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক এবং হাক্কুল্লাহ্ বা আল্লাহর হক সম্পর্কে মাওলানা ভাসানীর নিজস্ব একটা চিন্তাধারা ছিল। তাঁর বিশ্বাস অনুসারে এ দুটি হাক্কের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই। বান্দার হক যথাবিহিত আদায় করলেই আল্লাহর হাক্কও আদায় হয়ে যায়।

কখনো কখনো পবিত্র কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলতেন, "আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে যেহেতু অভাবহীন, কাজেই কোন কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যায় না। প্রকৃত বিচারে এই দু'টি হাক্কই অভিন্ন। হাক্কুল ইবাদ সম্পর্কে উদাসীন থেকে আল্লাহর হাক্ক আদায় করার চেষ্টা মূঢ়তা মাত্র। এ বিষয়ে আল্লামা আবুল হাশিমের বিশ্লেষণ মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে আশ্চর্য রকম মিলে যায়। আবুল হাশিম মনে করেন, হাক্কুল্লাহ্ আসলে হল 'হাক্কুল নাফস' অর্থাৎ নিজের জন্য প্রাপ্য, কেননা আল্লাহ্ সকল অভাব অনটনের উর্ধ্বে এবং তিনি কারও উপর নির্ভরশীল নন। বিশ্বাসী বান্দা 'সালাত' এ তাঁর সামনে ভুলুণ্ঠিত হয়ে বা রমযানের সিয়াম সাধনা করে তাঁর কোন উপকার সাধন করে না। নিজেরই কল্যাণ হাসিল করে।[২৫] আল্লাহ্র হাক্ক (হাক্কুল্লাহ্) সম্পর্কীয় প্রচলিত ধারণাও স্রষ্টার উপর মানবীয়তা আরোপমূলক আর একটি ধারণা যা ইসলামের শিক্ষার বিকৃতিমাত্র এমন কোন কাজ করবার অধিকার নেই যা তার নিজের বা অপরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাঁর মতে মানুষের পক্ষে হাক্কুল ইবাদ পালন করা একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ দায়িত্ব বাদ দিয়ে অথবা এর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ না করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, হাক্কুল ইবাদ বলতে শুধু মানুষের হাক্কই বেঝায় না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সমুদয় মানুষ ছাড়াও সমুদয় জীবের 'হাক্ক' ও এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) বলেছিলেন, 'ফোরাত নদীর তীরে একটি কুকুরও যদি অনাহারে মারা যায় ইসলামের খলীফা হিসাবে আমি তার জন্য দায়ী।'

আধুনিক যুগের শাসকদের মুখে এ ধরণের কথা কল্পনাও করা যায় না। হযরত উমর (রা.) এর এ বক্তব্যকে আধুনিক যুগের মানুষ বাগাড়ম্বর মনে করতে পারেন কিন্তু ওয়াকিবহাল সবাই জানেন, এ ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে এত দৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন যে গৃহদ্বারে একটি কুকুরকে উপবাসী রেখেও মুসলমান পূর্ণ আহার করতে পারেন না।

মাওলানা ভাসানী 'হাক্কুল ইবাদ' বা বান্দার হক আদায়ের জন্য সারা জীবন আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। দেশের নানা স্তরের সর্বহারা মেহনতি ও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষের মুক্তির জন্য তিনি যে লড়াই করেছেন, তাঁর মূল লক্ষ্য হাক্কুল ইবাদ প্রতিষ্ঠার। তাই বলে তিনি মার্কস উদ্ভাবিত শ্রেণী সংগ্রামের তত্তে তিনি আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। তবে যে কারণেই হোক তাঁর মনে এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, হাক্কুল ইবাদ যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে মেহনতি জনসাধারণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা আসা দরকার। তিনি এ কথা প্রায়ই বলতেন, যতদিন দেশে কৃষক শ্রমিক, প্রভৃতির রাজ প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিন হাক্কুল ইবাদ প্রতিষ্ঠা করা যাবেনা।[২৬]

১৯৪৬ সালে মাওলানা আযাদ সুবহানী যেদিন একটি অঙ্গিকার নামায় মাওলানা ভাসানীকে স্বাক্ষর করিয়েছিলেন, মূলত সেদিন থেকেই শুরু হল মাওলানার ন্যায়, সুন্দর ও শাশ্বত সত্যের সংগ্রাম। মাওলানা আযাদ সুবহানী মাওলানা ভাসানীর কাছ থেকে যে অঙ্গিকার নিয়েছিলেন তা ছিল এক তেজোদ্দীপ্ত অঙ্গীকার। আল্লামা আযাদ সুবহানী মাওলানা ভাসানীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন-"মাওলানা, মনে কর এটাই কা'বা শরীফ, এই কা'বা শরীফকে ছুঁয়ে তুমি অঙ্গীকার করবে, তুমি 'রাবুবিয়াত' কায়েম করবে।" তাঁর লক্ষ্য ছিল

Dhaka University Institutional Repository

একটি শোষণহীন ন্যায়ের সমাজ প্রতিষ্ঠা। তিনি আজীবন তাড়িত হয়েছেন এই মহাসত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

আসাম থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত শত শত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সবশেষে সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যার পরিসমাপ্তী ঘটে। মূলতঃ এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাঁর সারা জীবনের সমস্ত স্বপ্নের বীজ। আর এর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় খোদায়ী খেদমতগার সংগঠনের সম্মেলনে তার জীবনের শেষ ভাষণে। এ ভাষণে তিনি বলেন, "অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার শোষণ-জুলুমের সহায়ক। অজ্ঞতাই বিভেদ মানসিকতার জন্ম দেয়। জ্ঞানের অভাবই মানুষে মানুষে বৈরিতা ও হিংসার উৎস। দিকে দিকে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে তুলতে হবে। চিন্তার উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। 'সেবাই পরম ধর্ম' এই নীতি বাক্য অনুশীলন করে দেখাতে হবে। ইহার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন পালনবাদী মনোবিপ্লব। বাংলাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বে পালনবাদী জীবন দর্শনের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে সুশিক্ষিত চরিত্রবান ও জেহাদী চেতনাসম্পন্ন কর্মী তৈয়ার করার লক্ষ্যেই আমি ইতিহাস বিশ্রুত খোশনাদপুরে (সন্তোষ) হযরত পীর শাহ জামান কাশ্মীরীর (র.) মিশনের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিয়াছি।...রাবুবিয়াতের পথই অর্থাৎ সার্বজনীন মানবাধিকার ও সামগ্রিক কল্যাণের পথই সাফল্য ও শান্তির পথ।[২৭]

সর্বপরি আমরা বলতে পারি, মাওলানা ভাসানী ছিলেন এমনই একজন জন মানুষের লড়াকু জননেতা ও মেহনতি মানুষের বন্ধু, যার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রাবুবিয়াতের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত পালনবাদী তথা শোষণহীন ন্যায়ের সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। যে সমাজে থাকবে না মানুষের জীবনে অভাব অভিযোগ ও শ্রেণী বৈষম্য। তিনি আজীবন তাড়িত হয়েছেন এ মহাসত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

কাজেই আমাদের উচিত তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী, কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ভাব স্থায়ীভাবে গঠন করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

২. আবুল হাশিম

উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, অসাধারণ বাগ্মী, ইসলামের বিপ্লবী ভাষ্যকার এবং পন্ডিত ব্যক্তিত্ব আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) ছিলেন মূলত একজন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও সংগঠক। তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিল ইসলামী দর্শন ভিত্তিক। যে দর্শনের মূল সুর হল রাবুবিয়াত বা পালনবাদ। তাঁর মতে শোষণ, জুলুম ও বৈষম্য থেকে মুক্ত একটি মানব সমাজ সৃষ্টিই রাব্বুল আলামীনের পালন নীতির উদ্দেশ্য–সমগ্র প্রকৃতিতে যেমন তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, তেমনি মহাগ্রন্থ আল কুরআনে রয়েছে তার বিশ্লেষণ। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

"পুণ্যকর্ম পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে নেই বরং তা রয়েছে আল্লাহ্, শেষ বিচার দিন, ফেরেশতাগণ, ঐশী কিতাব ও নবীদের উপর বিশ্বাসে এবং আল্লাহ্র প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্থ, গৃহহীন ও প্রার্থীগণের সাহায্যার্থে আপন সম্পদ বিতরণে দাসত্ব মোচনে ব্যায়।" আরো বলা হয়েছে : 'যে সকল ব্যক্তি এতিমের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন, বুভুক্ষকে অন্নদান করে না, প্রতিবেশীর প্রতি উদাসীন, সেই সকল মুসল্লী আল্লাহ্র অভিশপ্ত।' আবুল হাশিম আল কুরআনের এ সমস্ত আয়াতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পালনবাদী দর্শন চর্চায় অনুপ্রাণিত হন।

২.১ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

কোন কিছুকে আমরা ভাল বলতে পারি কিংবা তার অস্তিত্ব সমর্থন করতে পারি, যদি ইহা তার উদ্দেশ্য সার্থক করে। মানুষ সম্বন্ধেও এ কথা সত্য, আল কুরআনের মতে, প্রকৃতির বিবর্তনক্রমে ধরা পৃষ্ঠে মানুষের আবির্ভাব অহেতুক বা আকস্মিক কোন ব্যাপার নয়। মানব সৃষ্টি একটি উদ্দেশ্যমূলক কর্ম। যে জীব পরস্পরের মধ্যে রক্তপাত করবে এবং ধরাপৃষ্ঠে শত রকম অন্যায়াচরণ করবে, তাকে কেন সৃষ্টি করা– এ নিয়ে ফেরেশতারা বিস্ময়বোধ করছিল। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে – স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক তার ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) সৃষ্টি করছি। তাই সাধারণত

Dhaka University Institutional Repository

মনে করা হয়, মানুষ আল্লাহর খলিফা। কিন্তু কুরআনের উক্ত আয়াত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একথা সত্য নয়।[২৮] কেননা এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের ইসমুজ-জাত ব্যবহার না করে তাঁর ইসমুস্-সিফাত "রাব" ব্যবহার করেছেন ; যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে নিজের পূর্ণ সত্তার খলিফা রূপে সৃষ্টি করেননি।

আল্লাহ অসীম আর মানুষ সসীম; আল্লাহ স্রষ্টা, মানুষ সৃষ্টি। সুতরাং সসীম কেমন করে অসীমের খলীফা হতে পারে এবং কেমন করেই বা সৃষ্টি স্রষ্টার পূর্ণ সত্তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে ? বস্তুত, আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর একটি বিশেষ গুণের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন।[২৯] উদ্ধৃত আয়াতে কারীমায় 'রাব' এই গুণবাচক নামের ব্যবহার অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলে দেয় যে, আল্লাহ তাঁর রাবুবিয়াত অর্থাৎ পালননীতির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

২.৯ ধর্ম সম্পর্কীয় চিন্তাধারা

আবুল হাশিমের *The Creed of Islam, As I See it,* রব্বানী দৃষ্টিতে, প্রভৃতিগ্রন্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর চিন্তাধারার কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে রাবুবিয়াত বা রাব্বিয়াত তথা স্রষ্টার পালনবাদী গুণের চর্চা। আর এই পালনবাদী নীতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে *The Creed of Islam* (ইসলামের মর্মকথা) গ্রন্থে প্রথমেই প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কীয় চিন্তা ধারাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, তথাকথিত যুক্তি ও বুদ্ধির সভ্যজগতে ধর্ম সর্বাধিক ব্যবহৃত একটি শব্দ[৩০] যা প্রগতি ও অগ্রগতির পথে অন্তরায় এবং সব রকমের দুঃখ দন্যের জন্য দায়ী। পাশ্চত্য দেশগুলোতে ধর্মকে মনে করা হয় এমন একটি বিজ্ঞান হিসেবে যা আল্লাহর অস্থিত্ব ও আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে নিয়ে আলোচনা করে ; মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে নিয়ে নয়। এক কথায় বলা যায় যে, ধর্ম হচ্ছে মানুষের জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা; পারলৌকিক সমস্যাবলীই যার মুখ্যবিষয়। আর ওই পারলৌকিক সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য ধার্মিক, পার্থিব জীবনের সব আরাম আয়েশ ত্যাগ করে বৈরাগ্যকে জীবনের আদর্শ রূপে গ্রহণ করে। আবুল হাশিম ধর্মের এরূপ ধারণার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে রূহ্বানিয়ত এ (বৈরাগ্য

Dhaka University Institutional Repository

জীবন) নয় রাব্বনিয়ত এ আরবী শব্দটি ধর্মের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে। পবিত্র কুরআন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের রুহানিয়াত চূড়ান্ত লক্ষ্য খন্ডন করে জোর দিয়ে ঘোষণা করেন যে, যিশুখ্রীষ্ট এবং অন্যান্য সব পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছিলেন রাব্বানিয়াত প্রচার করতে। রূহানিয়ত নয়।এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেন, ইসলামে রূবানিয়ত নেই। কাজেই বর্তমানে ধর্মকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তার অস্বীকৃতি ইসলামের একটি মূলনীতি।[৩১]

ইসলামে দ্বীন ও ধর্ম সমার্থবোধক। পবিত্র কুরআনে আরবী দ্বীনকে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র ফিতরত বা প্রকৃতি এবং সুন্নাহ বা আল্লাহ্‌র আইন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩২] সুতরাং দ্বীন ও ধর্ম বলতে বুঝায় প্রকৃতির নিয়ম সমষ্টি যা দ্বারা বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশ্ব এক অখন্ড সত্তা। এখানে সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক জাতি-প্রজাতি একে অপরের উপর নির্ভরশীল; কেউই সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়।

তবুও সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তু বিশেষ বিশেষ সূত্রাবলী বা নিয়ম-কানুন দ্বারা শাসিত হয়। এই সূত্রাবলী বা নিয়ম-কানুনের প্রতিটিই এক একটি বিজ্ঞান। আর ধর্ম সব বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। সৃষ্টির কোন কিছুই দ্বীন বা ধর্ম বা প্রকৃতির নিয়ম-কানুনের সীমা অতিক্রম করতে পারে না। এ জন্যই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র দ্বীন বা ফিতরতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।[৩৩]

সুতরাং ধর্ম বলতে আজকাল যা বুঝায় সে অর্থে ইসলাম একটি ধর্ম নয়। ইসলাম এমন এক বিজ্ঞান যা দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্য কথায় ধর্ম হচ্ছে আল্লাহর প্রকৃতি, আর এই প্রকৃতি অনুযায়ী বিশ্ব প্রকৃতির আইন-কানুন সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মকে স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে সত্য, কিন্তু তাই বলে ধর্মকে বাদ দেওয়া বা অস্বীকার করার কোন কারণ নাই।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ ইসলাম

ইসলাম একটি বিজ্ঞান।[৩৪] এর বিষয় বস্তু হচ্ছে মানুষ। অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সমষ্টিগত জীবন। ইসলাম মানব প্রকৃতিকে দাবিয়ে রাখে না বা তার উপর জোর-জুলুম চালায় না। ইসলাম দেহ, মন ও মস্তিষ্কের স্বাভাবিক প্রয়োজনকে স্বীকার করে মানুষের যাবতীয় সম্ভাবনার সুসামঞ্জস্য বিকাশ ঘটাতে চায়, যাতে অন্যের অনুরূপ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না করে মানুষের নিজস্ব সত্তার স্বাভাবিক প্রয়োজন সম্পূর্ণ পরিতিপ্ত হয়। ইসলাম মানুষের আসল প্রকৃতির ব্যাখ্যা দান করে এবং মানুষ ও তার প্রকৃতির মধ্যে, তার স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার মধ্যে শান্তি স্থাপন করে। ইসলামের উৎস[৩৫] হল, ১. আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে ব্যক্ত আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, ২. পবিত্র কুরআন, ৩. রাসূলে করীম (স.), ৪. তাঁর খলিফা ও অন্যান্য বিস্বস্ত সাহাবাদের জীবন ও আদর্শ।

পবিত্র কুরআন অনুসারে ব্যবহারিক ও কার্যকর দিক থেকে মানুষের কর্তব্য দ্বিবিধ। যথা - আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য (হাক্কুল্লাহ) ও মানুষের প্রতি কর্তব্য (হাক্কুল ইবাদ)।

পবিত্র কুরআন অনুসারে মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলা করলে বা সঠিকভাবে তা পালন না করলে আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য পালন নিষ্ফল বা বাতিল হলে যায়। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, "তুমি কি তাকে দেখনি, যে ধর্ম বা কিয়ামতকে মিথ্যা বলে, সে ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে তাড়িয়ে দেয় আর মিসকীনদের অন্ন দানে উৎসাহিত করে না। সুতরাং দুর্ভাগ্য সেই সব সালাত আদায়কারীর যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন। যারা সালাত আদায় করে লোক দেখানোর জন্য আর গৃহস্থলীর ছোটখাটো সাহায্য দিতে বিরত থাকে।"[৩৬] কাজেই এটা চরম দুঃখজনক ব্যাপার যে মানুষ আজ ইসলামের এই মানবিক দিক একেবারে ভুলে গেছে। আনুষ্ঠানিক ইবাদতকেই কেবল ধর্ম মনে করছে।[৩৭] আবুল হাশিম ইসলামের এই মানবিক বিকাশ দিকটিকেই তুলে ধরেছেন তার রাব্বিয়াত বা রাবুবিয়াত দর্শনের মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মতে, রাব বিয়াতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আল কুরআন-হাদিস প্রদর্শিত এবং বোধি ও মেধা দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা।[৩৮] রাবুবিয়াতের এই অর্থের আলোকে আবুল হাশিম মানুষের জীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তার পালনবাদী দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

২.৩.১ ইসলামী সংস্কৃতি

মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধন এবং তার ব্যবহারিক জীবনে ও প্রত্যক্ষ জড় পরিবেশে সেগুলোর প্রতিফলিত রূপই হচ্ছে সংস্কৃতি।[৩৯] সংস্কৃতি জীবন ও জগতের প্রতি মানুষের বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই ভিত্তিসমূহের পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে, ফলে মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সংস্কৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিচালিত হয়। তাই সংস্কৃতির উপর জীবন দর্শনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর, ব্যাপক ও মৌলিক; আর এ কারণেই জীবন দর্শন ভিন্ন হলে সংস্কৃতিও ভিন্ন হতে বাধ্য।

ইসলাম একটি জীবন দর্শন। এই জীবন দর্শন মানুষের বৃত্তিসমূহ পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতিকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়, তা-ই ইসলামী সংস্কৃতি। সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামের মূল্যবোধগুলো সক্রিয় থাকবে। ইসলাম হল মানুষের জন্য স্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত দ্বীন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বীন হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার ফিতরাত যার ছাঁচে মানুষের ফিতরাত অর্থাৎ প্রকৃতি গঠন করা হয়েছে। এই কথার তাৎপর্য হল, যে সকল অমোঘ প্রকৃতির নিয়ম মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাদের সমষ্টির নাম দ্বীন এবং পৃথক পৃথকভাবে এই প্রকার বিশেষ বিশেষ প্রকৃতিক নিয়ম দ্বীনের এক একটি অঙ্গ।[৪০] সুতরাং, ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বীনের বিরোধিতার অর্থ নিজ প্রকৃতির বিরোধিতা। মানুষ নিজ প্রকৃতির বিরোধিতা করে কোনদিনই সুখী ও সমৃদ্ধ হতে পারে না, বরং একমাত্র নিজ প্রকৃতির সাথে সুস ' তি রক্ষা করেই সে নিজের ইহকাল পরকালকে উজ্জ্বল ও আনন্দময় করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩.২ আধ্যাত্মিক জীবন

ইসলামী মতে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন শ্রেষ্ঠ ছাঁচে এবং মানুষের সম্ভাবনা অপরিসীম। এই অপরিসীম সম্ভবনার অধিকারী মানুষ যখন তার জড় সম্পদ ভোগ-লিপ্সার দাসে পরিণত হয়, তখন সে নিজেকে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত করে। সৃষ্টিতে সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, তার উপরে নেই। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখার সাধনাই আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি। মানুষ যখন নিজ মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য তার পরিবেশের উপর নির্ভরশীল হয়, তখন সে তার বাহ্য আড়ম্বরের পটভূমিতে কীট সদৃশ্য হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, রাবের প্রতিভূ মানুষ যদি আল্লাহর আখলাকে বিভূষিত হয়, তবে জড়-সম্পদ ও জড়-পরিবেশের উপর তার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তখনই সে জড় পরিবেশের পটভূমিতে সগৌরবে নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে পারে। তাই আমরা দেখতে পাই, জীর্ণ কুটিরবাসী, ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত, অর্ধভুক্ত অনাড়ম্বর মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর খোলাফায়ে রাশেদীনের ব্যক্তিত্বের সম্মুখে বিপুল ঐশ্বর্যশালী রোমান ও পারস্য সম্রাজ্যের সোনা-রূপাখচিত পোশাকে সুসজ্জিত প্রতিনিধিবর্গ নিজদিগকে সাতিশয় ক্ষুদ্র ও ম্রিয়মানবোধ করতেন। উল্লেখ্য যে, জীবনের বাস্তব দিকের প্রতি ইসলাম কোন রূপ অবহেলা প্রদর্শন করে না। মানুষ দুনিয়ার সম্পদরাজিকে উপেক্ষা করবে না–স্বীয় প্রয়োজনে ভোগ করবে; কিন্তু নিজেকে ভোগ সম্পদের ভোগ্য বস্তুতে পরিণত করবে না–এটাই ইসলামের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির মূল তত্ত্ব। ইসলামের এই সংস্কৃতি অনুযায়ী মানুষ যখন নিজেকে ভোগ সম্পদের জন্য বস্তুতে পরিণত না করে অন্যকে ঐ সম্পদ ভোগের সুযোগ দান করবে তখনই সে পালন করবে রাবুবিয়াতের দায়িত্ব।

২.৩.৩ নৈতিক জীবন

ভাল-মন্দের যে জ্ঞান মানুষের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে তা-ই নৈতিকতা।[৪১] ইসলামের দৃষ্টিতে যে কর্ম স্বভাবতঃ কর্মকর্তা বা অপর কারো ক্ষতি সাধন করে তা-ই অনৈতিক বা নৈতিকতা বিরোধী। এখানে কর্ম অর্থ কেবল পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নয় ; বরং চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ কারো সম্পর্কে কুচিন্তা ও হিংসা বিদ্বেষানুভূতিও নৈতিকতা বিরোধী। কুরআন কারীমে যে কর্ম ক্ষতিকর (যা ইহকালীন জীবনেও হতে পারে আবার

Dhaka University Institutional Repository

পরকালীন জীবনেও হতে পারে।) তাকে জুলুম বলা হয়েছে ; আর যারা জুলুম করে অর্থাৎ জালিম তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে।[৪২] তাই যে মন আপোষহীনভাবে জুলুম বিরোধী, সেই প্রকার মন গঠনের অনুশীলন এবং ব্যবহারিক জীবনে তার বহিঃপ্রকাশ নৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি।

ইসলামের নৈতিক বিধান কতগুলো মন্ময় (Subjective) নীতির সমষ্টি নয়। এটা অতিশয় বাস্তব, ব্যক্তিবিশেষের মনন-নিরপেক্ষ ও তন্ময় (Objective)। যে কর্ম মানব সত্তার ও তার পারিপার্শ্বিক বস্তুজগতে বিরাজমান সক্রিয় প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষতিকর ফল প্রসব করে, তাই জুলুম ও নৈতিকতা বিরোধী। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক জ্ঞান কতগুলো অবাস্তব, স্বেচ্ছা-উদ্ভাবিত ভাল-মন্দের বিচার-বুদ্ধি নয়।

যে কোন কর্ম স্বভাবত ব্যক্তি বা সমাজের সামগ্রিক শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিময় অগ্রগতিকে ব্যাহত করে, যা প্রাকৃতিক নীতি বিরোধী, তাই নৈতিকতা বিরোধী এবং ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী। আবার যে ব্যক্তি জুলুম করে এবং জুলুমের সহায়তা করে এবং যে ব্যক্তি জুলুমের প্রতিবাদ করে না–ইসলাম তাদের সকলকেই জুলুমের জন্য সমভাবে দায়ী করেন। যে প্রকারের ভোগ-লিপ্সা চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে মানব মনকে অন্যায়ের প্রতি প্রলুব্ধ ও অন্যায়প্রবণ করে, তা জুলুমের উৎস। এই জন্য পানাদি, মাদকদ্রব্য সেবন, জুয়া খেলা, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ নৃত্য-গীত-চিত্র-ভাস্কর্য ইত্যাদি এবং যৌন আবেদন প্রবণ রূপ প্রদর্শনী ইসলামী নৈতিক সংস্কৃতির পরিপন্থী। কাজেই ইসলামী নৈতিক বিধি অনুসারে অনৈতিক কাজ ব্যক্তির নিজের জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি সমাজের অন্যান্য মানুষ কিংবা প্রাণীর জন্যও ক্ষতিকর হতে পারে। আর এরূপ অনৈতিক কাজ স্রষ্টার রাবুবিয়াতের ঐশী নীতির পরিপন্থী। কোরআনের নীতিতত্ত্ব অনুসারে, জগৎ সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, এই উদ্দেশ্য সফলের পক্ষে সহায়ক যেকোন আচারণ ও তৎপরতাই ন্যায় বা পূণ্য। আর যেসব আচারণ এ তৎপরতা বাঞ্ছিত বিবর্তনে বিঘ্ন ঘটায় সে সবই অন্যায় বা পাপ।[৪৩] এই অর্থেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা পাপ, আর আত্মসমর্পণ করা পুণ্য।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩.৪ আধিমানসিক জীবন

আল কুরআন বলেন, আল্লাহ্ বিশ্ববাসীদের 'ওয়ালী' অর্থাৎ বন্ধু ও অভিভাবক এবং তিনি তাদেরকে তামস অর্থাৎ অজ্ঞতা হতে জ্যোতি : অর্থাৎ জ্ঞানের পথে পরিচালিত করেন। যারা কাফির তাদের বন্ধু ও অভিভাবক শয়তান এবং শয়তান তাদেরকে জ্ঞানের পথ হতে অজ্ঞানতার পথে পরিচালিত করে ; ফলে তারাই জাহান্নামী ও জাহান্নামেই তারা চিরকাল অবস্থান করবে। সুতরাং জ্ঞানই জান্নাত এবং অজ্ঞানতাই জাহান্নাম ; কারণ, জ্ঞানই মানুষকে অন্যায় হতে বিরত রাখে এবং অজ্ঞানতাই মানুষকে অন্যায়প্রবণ করে। জ্ঞান মূলতঃ দুই প্রকার, বহিরীন্দ্রিয় বা বুদ্ধি-লব্ধ জ্ঞান এবং অন্তরীন্দ্রিয় বা বোধিলব্ধ জ্ঞান। 'ঈমান বিলগা'য়েব' অর্থাৎ বহিরীন্দ্রিয়ের আয়ত্বাতীত সত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস মুমিন বা বিশ্বাসী হওয়ার প্রাথমিক শর্ত। তাই, প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার অনুসরণে অন্তরীন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন ইসলামী আধিমানসিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যে শিক্ষা সমভাবে বুদ্ধি ও বোধির উৎকর্ষ সাধন করে, সেই বিশুদ্ধ শিক্ষা ও ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগ ইসলামের আধিমানসিক সংস্কৃতি।[৪৪] ইসলামে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বল-প্রয়োগ নিষিদ্ধ। আল কুর'আন বলেন, 'দ্বীন সম্পর্কে কোনরূপ বল-প্রয়োগ নেই।' সুতরাং চিন্তা, বিবেক ও মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা এবং পরমত সহিষ্ণুতা ইসলামী আধিমানসিক সংস্কৃতির অন্যতম আদর্শ। এ কারণেই খিলাফত যুগে বিরুদ্ধ-মত পোষণের দায়ে কাউকেও হ্যালমক বিষ পানে, অগ্নি-কুণ্ডে বা ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ হারাতে হয়নি।

২.৩.৫ সামাজিক জীবন

সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ইসলামী সমাজের মূল ভিত্তি। কিন্তু এ সাম্য যোগ্যতার নয়; ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ বিশেষ যোগ্যতার বিকাশের দ্বারা সমাজ জীবনে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার ও সুযোগের সাম্য। বক্তাভিজাত্য ও উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের গৌরব অথবা বিশেষ কোন পেশা ইসলামী সমাজ জীবনে মানবিক মর্যাদার মাপকাঠি নয়। চারিত্রিক সততা ও কর্তব্য পরায়ণতাই সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করে। ফলে, ইসলামের দৃষ্টিতে একজন সৎ ও কর্তব্য পরায়ণ চর্মকার অসাধু ও কর্তব্যবিমুখ রাষ্ট্রপ্রধান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। মানুষ ও মানবিক মর্যাদার প্রতি এ দৃষ্টিভঙ্গিই ইসলামী সামাজিক সংস্কৃতির প্রথম সোপান।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অর্থ সকল মানুষকে কর্মনিরপেক্ষ সমান মর্যাদা দান নয়–ভ্রাতৃত্বের অর্থ সকল মানুষের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ সহানুভূতি। সততা, যোগ্যতা ও কর্মতৎপরতার অনুপাতে মানুষ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। পক্ষান্তরে, অন্যায়কারী প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ইহকালে, অথবা ইহকাল ও পরকাল উভয়কালে স্বীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। ইসলাম যা অন্যায় তাকে ঘৃণা করতে শিক্ষা দেয়; কিন্তু অন্যায়কারীকে ভ্রাতৃসুলভ সহানুভূতির সঙ্গে অন্যায়ের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দান করে। কুরআন কারীমের মতে, অন্যায়কারীকে সুযুক্তি ও ভদ্র ব্যবহারের দ্বারা আহ্বান করা কর্তব্য। অন্যায় ও জুলুম প্রতিরোধের প্রয়োজনে ইসলামী আইন জালিমের শাস্তি-বিধানের নির্দেশ দেয় এবং এর ফলে জালিম ও জুলুমবিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিলে কঠোর হাতে দুষ্কৃতিকারীদের দমন অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু এর পাশ্চাত্যে থাকে শুভেচ্ছাও কর্তব্যবোধ–অন্য কিছু নয়। বিশ্ব মানবের এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবনে এর বাস্তবায়ণই সামাজিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি।

২.৩.৬ অর্থনৈতিক জীবন

খিলাফত–এই কথাটির তাৎপর্য উপলব্ধিই অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির জ্ঞান। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন কারীমে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর 'রাব' গুণের খলিফা করেছেন। সুতরাং কুরআন কারীমের মতে, আল্লাহ্ তা'আলা যে নিয়মে জীবের সৃষ্টি, পালন ও বিবর্তণ নিয়ন্ত্রণ করেন, সেই নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে নিজেকে এবং আল্লাহ্র সৃষ্ট অপর জীবকে পালন করার দায়িত্ব অর্পন করে তিনি মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রূপে সৃষ্টি করেছেন। ইসলামও অপরাপর জীবন-দর্শনের মত জীবন ও জগতের প্রতি একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি শোষণ অথবা শাসনের নয়–পালনের। এটিই খিলাফতের তাৎপর্য এবং ইসলামী অর্থনীতির মূল কথা। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু বিদ্যমান, তাদের সকলের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা, মানুষ নয়। মালিকানা স্বত্বের অর্থ ইচ্ছামত বস্তুর ব্যবহার, অব্যবহার ও অপব্যবহারের অধিকার। এই অধিকার মানুষের নেই। ইসলামী মতে, মানুষ জড়-সম্পদ অধিকার করবে মালিক রূপে নয়–আল্লাহ্র রাব গুণের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিভূ রূপে। সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতিতে সম্পদের অধিকার ও ব্যবহার ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী হতে হবে।

অপরের কল্যাণে অন্তরায় ও উদাসীন না হয়ে সম্পদ ভোগের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু এই ব্যবহারিক স্বত্বাধিকারও তাদেরকে অর্জন করতে হয় আল্লাহ্ প্রদত্ত শ্রম-শক্তির সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন কারীমে বলেন, "মানুষ যার জন্য শ্রম করে, তা ব্যতিরেকে কিছুই তার প্রাপ্য নয় আবার। কোন সংগত কারণে যারা শ্রমে অসমর্থ, সামাজিক জীবন-মাপের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্মের সংস্থান – এই মৌল জী বনোপকরণ সমূহের নিম্নতম প্রয়োজন মিটাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সমাজের সমর্থ ব্যক্তিদের কাঁধে ন্যস্ত রয়েছে। এই দায়িত্ব পালনেরই নাম 'হাক্কুল ইবাদ' আদায় করা। সালাত কায়েমের নির্দেশের সঙ্গে যাকাত কথাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার গূঢ় অর্থ এই যে, 'হাক্কুল ইবাদ' আদায় না করলে সালাত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ইসলামী অর্থনৈতিক বিধানের দ্বিতীয় মূলনীতি হলো সম্পদ মওজুদ ও জমা না করা। কোরআনে বলা হয়েছে, "আফসোস তাদের জন্য যারা সম্পদকে জমা করে রাখে এই মনে করে যে, সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী করবে। কিছুতেই নয়। তাকে অবশ্যই এমন কিছুতে নিক্ষেপ করা হবে যা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।" আরো বলা হয়েছে, "হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের আমরা যে প্রাচুর্য দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করো দিন (হাশরের দিন) আসার আগে যখন কোন প্রকার চেষ্টা-তদবির কাজে আসবে না, বন্ধুত্ব ও মধ্যস্ততাও না। যারা বিশ্বাস ভঙ্গ করে তারা অন্যায়কারী।"

কাজেই দেখা যায়, পবিত্র কোরআন পার্থিব সম্পদের প্রতি অনুরাগ নিষিদ্ধ করে এবং অন্যের কল্যাণে নিজের বিষয়-সম্পত্তি থেকে অর্থ ব্যয়ে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে খাদ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই খাদ্যশস্য মওজুদ রাখা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। মহানবী (স.) বলেছেন, "দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হবে এ উদ্দেশ্যে যে কেউ খাদ্যশস্য মওজুদ করে রাখে সে পাপী।" কোন জাতির কোন প্রকার উদ্বৃত থেকে গেলে অভাবগ্রস্থ, অন্যান্য জাতিগুলোকে লোকে বঞ্চিত রেখে অথবা তাদের দুরবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা, দরকষাকষি ইসলাম অনুমোদন করে না। অধি কন্তু একটি কুকুরকেও অভুক্ত রেখে কোন মুসলমানকে তার পুরোপুরি আহার্য গ্রহণের আনুমতি দেয়া হয় না। ইসলামী অর্থনীতিতে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। আবুল হাশিমের ভাষায়ঃ In order that a state may style itself with some justification as an Islamic Republic, it must formulate and faithfully execute its policy of agriculture, industry, trade and commerce for a harmoious and progressive welfare of its people and a scheme conducive to the fulfilment of this end, is Islamic.[৪৫]

২.৩.৭ রাজনৈতিক জীবন

খিলাফত, এই কথাটির একটি বিশেষ রাজনৈতিক অর্থ আছে। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন কারীমে বলেন, "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম অধিকার একমাত্র আল্লাহর–মানুষের নয়, সে ব্যক্তিই হোক আর ব্যক্তি সমষ্টি জাতিই হোক।" সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রপতি সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন নন। ইসলামী রাষ্ট্রের নাম খিলাফত অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব এবং রাজনৈতিক জীবনে এই প্রতিনিধিত্বও আল্লাহর রাবুবিয়াতের প্রতিনিধিত্ব।[৪৬] ইসলামী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা অধিকার ও তা প্রয়োগ করবেন জনগণের কল্যাণে। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি নর-নারী নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনে ও সংঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্রকে তার এই মহান কর্তব্য পালনে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে সাহায্য করবেন। কারণ, প্রত্যেক মানুষই আল্লাহর রাবুবিয়াতের খলিফা–শুধু রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপতি নন। ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ কোন বৈষম্য অথবা মর্যাদার প্রাচীর বিরাজ করে না। কেননা, এই অবস্থায় কেউ কারো দাসও নয়, প্রভুও নয়–পরস্পর ভাই ভাই, এক আল্লাহর দাস এবং একমাত্র তাঁরই অধীন। তাদের উভয়েরই দায়িত্ব এক আল্লাহর

Dhaka University Institutional Repository

রাবুবিয়াতের প্রতিনিধিত্ব করা এবং দ্বীনের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবন পরিচালিত করা। তারা প্রত্যেকেই সমাজের একটি বিশেষ কর্তব্য পালনের দায়িত্বে আসীন। কেউ স্বীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বা ভুল করলে অপরের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তাকে সাহায্য করা বা সংশোধন করা। এই কারণে ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও সরকারের কার্যক্রম সাধারণের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকে এবং প্রত্যেকটি নাগরিক তার সমালোচনা করে তা সংশোধনের অধিকার রাখে। এই আদর্শের অনিবার্য অনুসিদ্ধান্ত আইনের শাসন।

আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেকে সমান ; অর্থাৎ প্রত্যেকের উপর আইনের বিধান সমভাবে প্রযোজ্য। এমনকি জন-স্বার্থ, জাতীয় মর্যাদা বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভৃতির অজুহাত খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান এবং উচ্চতর জাতীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গও এ ক্ষেত্রে কোনরূপ বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারেন না। তাই দেখা যায়, হযরত ওমর (রা.) ও হযরত আলীকে (রা.) পর্যন্ত খলীফার পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায়ও সাধারণ নাগরিক কর্তৃক আনীত অভিযোগের জওয়াব দানের জন্য বিচারকের সম্মুখে আসামীর বেশে দাঁড়াতে হয়েছে। কুফার গভর্ণরকে মদ্যপানের দায়ে চল্লিশ বেত্রাঘাতের দণ্ড মাথা পেতে মেনে নিতে হয়েছে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ইসলামে পালনবাদী নীতি অনুসৃত হয়। এ প্রসংগে আবুল হাশিম বলেনঃ

In Islam morality and law tend to coincide. Any act harmful either to the doer or to others is immoral, and this is also the first principle of legislation in Islam.[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

৩. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

প্রখ্যাত দার্শনিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিযশা রাজনীতিবিদ এবং জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬–১৯৯৯) ছিলেন এক বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মরমি কবি হাসন রাজার দৌহিত্র ও নাতি জামাই।[৪৮] বহু গুণে গুণান্বিত, বহু বিশেষণে এই মহান প্রতিভা একাধারে সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, সুচিন্তিত মননশীল সুবক্তা। এর পাশাপাশি শরীয়তের পাকা অনুসারী একজন খাঁটি মুসলমান। সকল রকম ধর্মীয় গোঁড়ামীর ঊর্ধ্বে থেকে সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। "সবার উপরে মানুষ সত্য " এই শাশ্বত বাণীর পাশাপাশি মানুষের জন্যই স্রষ্টার সকল সৃষ্টি। সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টা বিরাজমান, এ ধারণাতে বিশ্বাসী ছাত্রজীবন হতেই তাঁর মেধা ও সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের প্রতি তাঁর একত্ববোধের কারণেই তিনি তৎকালে অভিজাত ও ধনী পরিবারে প্রচলিত অনেক রকম রেওয়াজ ও সাধারণ মানুষের প্রতি অমানবিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন।[৪৯]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন ধরণের লেখার মাধ্যমে জীবন সংশ্লিষ্ট নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কখনও দার্শনিক লেখার মাধ্যমে, কখনও ছোট গল্পের মধ্যদিয়ে, কখনও উপনাস্যের আকারে, কখনও নাটক ও কবিতার পথ ধরে তিনি জীবনের অর্থ ও তাৎপর্য খুঁজেছেন। তিনি জ্ঞানের প্রকৃতি ও উৎস সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তিনি বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, বিচারবাদ, স্বজ্ঞাবাদ তথা পাশ্চত্য দর্শনের জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ক মতবাদগুলো পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর এ পর্যালোচনায় তিনি এসব উৎসের সীমাবদ্ধতা দেখিয়েছেন এবং প্রকৃত ও পূর্ণ জ্ঞানের উৎস হিসেবে ওয়াহীকে (ঐশী দিশা) সামনে নিয়ে এসেছেন।[৫০] তিনি একটি আদর্শ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের যে স্বপ্ন দেখেছেন তারই লক্ষ্যে বিভিন্ন মানব রচিত মতবাদের যৌক্তিকতা ,মানব কল্যাণের জন্য তাদের প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনা, বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা হলে কী ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বা হতে পারে সে সব বিচার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ প্রভৃতি মতবাদের মূল্যায়ন করেছেন। এসব পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে তিনি তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

নিজস্ব অবস্থান স্পষ্ট করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি বিভিন্ন যুক্তি ও বাস্তব উদাহরণের মধ্যদিয়ে একটি পরিপূর্ণ ও কল্যাণকর জীবন বিধান হিসাবে ইসলামকে উপস্থাপন করেছেন। অবশ্য তাঁর এ ইসলাম গতানুগতিক ভাবে পরিবেশিত ও অনুশীলনকৃত ইসলাম নয়। তিনি ইসলামের সত্যিকার মর্মবাণীর অনুসন্ধান করেছেন এবং অবিকৃত মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি জীবন বিধান হিসেবে পাঠকদের সামনে হাজির করেছেন।[৫১]

তাঁর মতে, যে দর্শনের উপকরণ হবে জীবন্ত মানুষের সবগুলো বৃত্তি ও প্রবৃত্তি। তার লক্ষ্য হবে পূর্ণ মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। তার নৈতিক আদর্শ হবে পরস্পর ভিন্নমুখী প্রবৃত্তির সামঞ্জস্যবিধান। তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ হবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির অধিকারের সমন্বয়। সে পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শনেরই অপর নাম ইসলাম। ইসলামকে বলা হয় মানবতার ধর্ম। ইসলাম যে প্রকৃতি ও মানবতার ধর্ম এ সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মন্তব্য করেছেন যে: ইসলামকে বলা হয় মানবতার ধর্ম। ইসলাম গোড়াতেই মানব জীবনের সবগুলো দিককে স্বীকার করে নিয়েছে বলে ইসলামকে বলা হয়েছে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। মানব প্রকৃতির অনুকূলেই তার ভিত্তি গড়ে উঠেছে বলে মানুষের নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) বলেছেন: সদ্যজাত শিশু সত্য ধর্মেই জন্ম নেয়-তার পিতা মাতা তাকে ইহুদী, ক্রিশ্চিয়ান বা সিরিয়ান করে তোলে। ...ইসলামকে স্বাভাবিক ধর্ম বলাতে একটি কুয়াশার সৃষ্টি হতে পারে। কারণ প্রকৃতিবাদ ও স্বাভাবিক ধর্ম বলেই দাবী করে। প্রকৃতির বিভিন্ন দিকের সঙ্গে একাত্ব হওয়া প্রকৃতিবাদীদের জীবনের লক্ষ্য। ...প্রকতবাদীদের অর্থে স্বাভাবিক ধর্ম নয়। আবার স্বাভাবিক ধর্ম বলতে যদি মনে করা হয়, মানবজীবনের কোন স্বাভাবিক বৃত্তির অনুশীলন, সে অর্থেও ইসলাম স্বাভাবিক ধর্ম নয়। ইসলাম বলতে মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথে সহায়ক ধর্মই বুঝতে হবে।[৫২] বস্তুত, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরবের কাছে ইসলাম মানবতার ধর্ম। যা কিছু মানবতার উদ্বোধক ও বিকাশন, তাই ইসলামের অঙ্গীভূত। তাইতো তাকে বলতে শুনি:প্রকৃত ইসলামী জীবনব্যবস্থা মানবতাবাদেরই একরূপ। মানবজীবনকে সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক রাখার জন্য এ দুনিয়ায় যে ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল তারই নাম ইসলাম এবং তা মানবতাবাদের এক সংস্করণ এজন্যই ইকবাল এক জায়গায় বলেছিলেন,

Dhaka University Institutional Repository

Communism Plus God is Islam অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করাই ছিল ইসলামের রাজনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য। তবে তার মধ্যে মানব জীবনের আরও নানা দিকের সন্তোষ বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে।[৫৩]

তিনি মুসলিম সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস ও কর্ম এবং প্রচলিত বিশ্বাস ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন মুসলিম সমাজে প্রচলিত অনেক বিশ্বাসই ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মুসলিম সমাজে আচরিত অনেক কাজই ইসলাম সম্মত নয়। প্রকৃত ইসলাম বুঝতে হলে আমাদের পবিত্র কুরআন, সহিহ হাদীস এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগকে বুঝতে হবে।

এখন আমরা সংক্ষেপে তাঁর দর্শনের মানবতাবাদ তথা 'রাবুবিয়াত' এর স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করবো। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মানবতাবাদকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং এর উৎস তিনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় অনুসন্ধান করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদ পর্যালোচনা করে তিনি তাঁর ব্যবহারিক মানবতাবাদে উপনীত হন। ইসলামি ইতিহাস ঘেঁটে তিনি বিখ্যাত সাহাবী আবুজর গিফারীর জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন এবং 'সত্যের সৈনিক আবুজর' নামক বই প্রকাশ করেন।[৫৪] তিনি এ বইয়ে ইসলামের মানবতাবাদী তথা সাম্য ও মৈত্রীর দিকটি তুলে ধরেন। তা ছাড়া 'জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম' গ্রন্থেও তাঁর মানবতাবাদী তথা পালনবাদী চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩.১ ইসলামী নীতির রূপায়ণ

দেওয়ান মেহাম্মদ আজরফ নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক বিষয়ের উপর ইসলামী নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর 'রাবুবিয়াত দর্শন' তথা মানবতাবাদী দর্শন ব্যাখ্যা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.১ সালাত

সালাত শব্দের সাধারণ অর্থ উপাসনা। কিন্তু কুরআন কারীমে ব্যবহৃত'সালাত' শব্দের অর্থ শুধু উপাসনা নয়। এর অর্থ হচ্ছে সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম সৃষ্টিকর্তার আদেশ নির্দেশের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ।[৫৫] সালাতের মূল লক্ষ্য হচ্ছে একদিকে জীবনকে নানা-রকমের রিপু এবং অসৎ প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রস্তুত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গুণাবলী এ জগতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। এ সালাতের মধ্যে দুটো দিক রয়েছে। একটিকে বলা হয় তার পারমার্থিক দিক, অপরটিকে বলা হয় তার সামাজিক দিক। সামাজিক দিকের আলোচনা করলে দেখা যায় প্রতিদিন পাঁচবার সকল মুমিন মুসলিমকে একত্রিত হওয়ার জন্য তাগিদ রয়েছে। সালাত মুসলিমদের জীবনে ঐক্য, প্রেম, মৈত্রী, সৌহার্দ্য প্রভৃতি সৃষ্টির জন্য তাদের প্রত্যেককে দিবা রাত্রিতে পাঁচবার একত্রিত হওয়ার সুযোগ দান করে বলে এর রয়েছে এক অপূর্ব সামাজিক গুরুত্ব।[৫৬]

রাসূলে আকরাম (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মসজিদ ছিল একাধারে মুসলমানদের পার্লামেন্ট, সুপ্রীম কোর্ট, গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়। মসজিদকে কেন্দ্র করেই জীবনবিকাশের ধারাগুলো চালু ছিল। এজন্য আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করার জন্যতো বটেই, পরোক্ষভাবে মুসলিম জীবনের নানাবিধ আইন কানুন প্রণয়নের করার জন্য বা বিচার লাভের জন্য মসজিদে একত্রিত হওয়া ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ মসজিদে অবস্থান করেই মুসলিমরা সৃষ্টিতত্ত্ব বা দুনিয়ার বিকাশের আদি কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করতেন। এবং পারস্পরিক জানা শোনার সুযোগে একে অন্যের প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসত।

৩.১.২ যাকাত

যাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন বা স্তম্ভ। যাকাতের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি হয়। কৃপণতা ও সম্পদের প্রতি লালসা দূর হয়। যাকাত মুসলিমদের এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করে যে যখনই আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার প্রয়োজন

Dhaka University Institutional Repository

হয় ,তখনই সে অন্তর খুলে রিক্ত হস্থে তা দান করে। মহান আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন আবার জীবন যাপনের জন্য তিনি বিভিন্ন সম্পদও দান করেছেন। তবে পৃথিবীর সব মানুষ সমান সম্পদের অধিকারী নয়। তাই ধনীদের সম্পদের মধ্যে গরীবের অধিকার রয়েছে। আল্লাহ্ পাক বলেন,"তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও।তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু নিজেদের জন্য পূর্বে প্রেরণ করবে,আল্লাহর কাছে তা পাবে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা।"[৫৭] স্বতঃপ্রণোদিত, উদ্বৃত্ত অর্থ বা অন্য কোন সম্পদ আত্মার কল্যাণের জন্য দান করাই যাকাতের মূল উদ্দেশ্য। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে,আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিলে এ দুনিয়ার কোন সম্পদের উপর মানুষের কোন মালিকানা থাকতে পারেনা। উল্লেখ্য ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা দরিদ্রদের বেকার বানানো না বরং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুদূর প্রসারী। এর দ্বারা বেকারদের কাজের ব্যবস্থা হয়, উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, মুসলিম উম্মাহর সম্পদ বাড়ে। দরীদ্রদের তুলে আনা হয় ধনীদের কাছা-কাছি স্তরে , এতে দূর হয় ধনবান ও মালিক শ্রেণীর প্রতি দরিদ্র ও শ্রমিকের বিদ্বেষ ও অসন্তোষ এবং মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর ভালবাসা , শ্রদ্ধা ও প্রীতি জন্মে, শক্তিশালী হয় মুসলমানদের সামাজিক শক্তি।

৩.১.৩ সিয়াম

সিয়াম শব্দের আভিধানিক অর্থ নিবৃত্তি। অর্থাৎ পাশবিক কামনা বাসনার নিবৃত্তি। সিয়ামের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে পাশবিক প্রবৃত্তির দমন ও উন্নততর প্রকৃতির বিকাশ।[৫৮] ইহা পালনের মধ্যে রয়েছে পাশবিক শক্তির প্রাবল্য, উহার উত্তেজনা ও প্রতিরোধের উপায়। এ কারণেই মহান আল্লাহ্পাক বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতগনের উপর। আশা করা যায় তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হবে।"[৫৯]

সাওমের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আল্লামা ইকবাল বলেন: 'সাওমকে ব্যক্তিগত জীবনেও পালন করা সম্ভব। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির জন্য এক ব্যক্তি হয়ত বৈশাখ মাসে অথবা মহররম মাসে সাওমের নীতি পালন করবেন। অপর ব্যক্তি হয়ত জ্যৈষ্ঠ মাসে বা সফর মাসে সে

Dhaka University Institutional Repository

নীতি পালন করবে,তাতে অপত্তি থাকার কারণ কি? তার উত্তর হল–এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য হল –কেবল ব্যষ্টি জীবনের সংশোধন নয়। এক্ষেত্রে আল্লাহ্র উদ্দেশ্য গোটা মানবজাতির আত্মার শুদ্ধি। এ কারণেই একটা নির্দিষ্ট চান্দ্রমাসে আল্লাহর কালামে প্রত্যয়শীল সকল মানুষের জন্যই সাওমকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বিশুদ্ধ মানবজীবন তথা মুসলিম জীবনে সাম্য ঐক্যের নীতি প্রতিষ্ঠার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। সকল মানুষ যাতে একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের পাশবিক প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ দমন করে,প্রকৃত মানবিক চরিত্র বিকাশের জন্য একসঙ্গে সাধনায় লিপ্ত হয়, তার জন্য একটা বিশেষ মাসে সকলকেই তার অনুশীলনের তাগিদ দেয়া হয়েছে।[৬০]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মতে প্রকৃতপক্ষে সালাত (নামায) বা সিয়াম ইসলামী জীবনধারার কোন খাপছাড়া অনুশীলন নয়। ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্র 'রাব' নামক গুণ ও সার্বভৌমত্বের ওপর প্রত্যয়। আল্লাহ্কে এক, অদ্বিতীয় স্রষ্টা, প্রতিপালক ও বিবর্তনকারী হিসেবে গ্রহণ করলে এবং তাকেই এ বিশ্বজগতের একমাত্র মালিক বলে স্বীকার করলে সাওম বা সালাত অপরিহার্য রূপে দেখা দেয়। আল্লাহ্ যদি এ জগতের স্রষ্টা হন এবং তিনি যদি এ জগতের সকল জীবকে প্রতিপালন করেন এবং তিনিই যদি এ দুনিয়াকে অবনত পর্যায় থেকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যান এবং এ বিশ্ব বিধানে যা কিছু রয়েছে তার মালিকানা একমাত্র তাঁরই হয়–তাহলে তাঁর সেসব গুণের আলোকে এ দুনিয়াকে ঢালাই করে সাজানো-গোছানো প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। এ দুনিয়ায় মানুষের অবস্থান ও জন্মগত তারতম্য রয়েছে। কিন্তু সকলের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্র সকলের প্রতিই রয়েছে সমান স্নেহ, সমান করুণা, সমান সহানুভূতি। অথচ মানুষ তার নিজ সম্বন্ধে এতো বেশি আত্মকেন্দ্রিক যে, সে তার নিজের সম্বন্ধে স্বার্থ চিন্তায় সর্বদাই লিপ্ত থাকে। এজন্য মানুষ যাতে দরিদ্র জনসাধারণের অর্থাৎ যারা সারা মাসে একবেলাও পেট ভরে আহার করতে পারে না, তাদের দুঃখ কষ্টের সহানুভূতি যাতে অপরাপর সকল মানুষের মনে সৃষ্টি হয়, তার জন্য ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই ক্ষুধার যাতনা সমভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ্ রমযান মাসে দিনের বেলা সকলের জন্যই পানাহার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে 'রাব' হিসেবে আল্লাহ্ কেবল এ

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়াকে নয়–দুনিয়ার মানুষকে পালনবাদী ও বিবর্তনকারী হিসেবে উন্নততর মানসিকতার পর্যায়ে উত্তোলন করতে প্রয়াসী।

এছাড়াও 'সাওমে'অনুশীলনে রত মানুষ সর্বাবস্থায় বুঝতে পারে, ধন-সম্পদ তার অধিকারে থাকলেও তা যথেচ্ছা ব্যয় করার অধিকার বা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকার অধিকার তার নেই;তাকে এ সম্পদ ভোগ করতে হবে সার্বভৌম শক্তির মালিক মহান আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ অনুসারে। মানুষকে এটা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতে হবে যে, সত্যিকার ভাবে তার অধিকারভুক্ত সম্পদে তার নিজের কোন মালিকানা নেই। সত্যিকার মালিকানা রয়েছে সর্বতোভাবে একমাত্র আল্লাহ্ সুব্হানা তা'আলার। তাই সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এমাসে মানুষকে সম্পদের ভোগ থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে।

৩.১.৪ হজ্জ ও কুরবানী

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হজ্জের একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। হজ্জ ও কুরবানী ইভয়েই একই সূরার পাশাপাশি তিনটি আয়াতে অবতীর্ণ হয়েছে বলে তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক যোগসূত্র রয়েছে। পবিত্র কুরআনের সূরা হজ্জ-এ বলা হয়েছে,"এবং স্মরণ কর, যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য নির্ধারণ করেছিলাম সেই গৃহের স্থান, তখন বলেছিলাম, 'আমার সঙ্গে কোন শরীক স্থির করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, করে ও সিজ্দা করে।"[৬১]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ মক্কার পবিত্র কাবাগৃহের বর্নণা প্রসঙ্গে বলেন, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সঙ্গে যেন কোন কিছুকে অংশীদার না করা হয় এবং যারা মনোনিত উপাসনা, প্রার্থনা এবং প্রদক্ষিণ করতে আসে তাদের জন্য এ ঘরকে পবিত্র রেখো।[৬২] কিন্তু শিরকে নিমজ্জিত কুরাইশরা রাসূল-ই-আকরাম (স.) ও তাঁর অনুগামীগণ আল্লাহ্র অংশীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না বলে তাদেরকে কাবা গৃহে প্রবেশ করতে দিতনা। তাই তাদের অত্যাচার এবং অনাচারের বিরুদ্ধে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাদেরকে অকৃতজ্ঞ বলা হয়েছে। তারা ইব্রাহীমের কথা লংঘন করে কাবা গৃহে প্রতিমা স্থাপন করেছিল এবং তাদের উপাসনা

Dhaka University Institutional Repository

করত। এ জন্য ইব্রাহীম (আ.) কে বলা হয়েছে,"তুমি সমগ্র মানবজাতির জন্য হজ্জ সম্বন্ধে ঘোষণা করে দাও,তারা যেন নিজেদের কল্যাণ এবং পাপ মুক্তির জন্য প্রতিবৎসরের নির্ধারিত দিনে এ পূণ্যধামে উপস্থিত হয় এবং তাদের জন্য আমি যে গৃহ পালিত পশু বৈধ করেছি, তা থেকে যেন তারা তাদের মনোনিত ও নির্ধারিত পশু আমার নামে উৎসর্গ করে।"[৬৩]

হজ্জ ও কুরবানীর শিক্ষা

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ ক্ষেত্রে কল্যাণ কোথায় ? নিশ্চয়ই কল্যাণ রয়েছে। হজ্জ ব্রত পালন উপলক্ষে দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ নানা ভাষাভাষী লোক সমবেত হয় এবং তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে। বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে পরস্পর পরিচয় হবে এবং তাদের মধ্যে ইখওয়ান বা ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠবে। এ সময়ে গৃহপালিত পশু উৎসর্গ করতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আনুগত্য ও তাঁর সৃষ্ট জীবকে তাঁরই নামে উৎসর্গ করার রয়েছে মহান সুযোগ। প্রকৃতপক্ষে সাংসারিক জীবনে গৃহপালিত গরু, মহিষ, উট, দুম্বা বা বকরি মানুষের কাছে অনেক সময় এমন প্রিয় হয়ে ওঠে যে,তাদের অনুপস্থিতিতে বা মৃত্যুতে মানুষ শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। কুরবানীতে সে সব মনোনীত ও প্রিয় পশুকে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করতে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্পাক ত্যাগের পরীক্ষা নেন।

4

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মতে, হজ্জ ও কুরবানীর দার্শনিক দিকের আলোচনা করলে দেখা যায়, হজ্জের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর তাওহীদবাদের প্রতিষ্ঠা। যাতে সে তাওহীদের গোড়া পত্তনকারী হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মানুষ যাতে পরিচিত হতে পারে তার জন্যই মানুষকে এ কাজে আহ্বান করা হয়েছে। তাওহীদের স্বার্থকতা হচ্ছে মানুষে মানুষে প্রভেদের বিলোপ সাধন। একই আল্লাহ্র বান্দা হিসেবে এ দুনিয়ার সকল মানুষ সমান। ভাষা, বর্ণ, রক্ত, আর্থিক প্রভেদ যাতে এ দুনিয়ার মানুষের মধ্যে কোন ভেদ সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য ভৌগোলিক পূজ্য দেবতাদের বা পিতৃ পিতামহদের পূজ্য দেবতাদের বর্জন করে তাওহীদের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য কুরআন কারীমে তাগিদ দেয়া হয়েছে। এজন্যই বলা হয়েছে, ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর

Dhaka University Institutional Repository

বলে দাবী করা সত্ত্বেও তোমরা আমার আদেশ পালন করছনা–তাতে তোমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছো।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এর মতে, তাওহীদের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। তাঁর মধ্যে সতত সচেতন, ক্রিয়াশীল সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিবর্তনকারী, এক সত্তার যেমন ধারণা রয়েছে তেমনি ন্যায় বিচার ও সার্বভৌম সত্তার ধারণাও রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাওহীদ পন্থীর কাছে আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটা নাম এক একটি গুণও বটে এবং মানবজীবনের পক্ষে আল্লাহ্‌র পরিচয়েরও এক একটি মাধ্যম বটে। সঙ্গে সঙ্গে এগুলো মানবজীবনের আদর্শও বটে। মানুষ এদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সর্বাঙ্গীণ পরিচয় না, পেলেও এগুলোর অনুসরণ করে নিজের জীবনকেও উন্নত করতে পারে।[৬৪] এদের মধ্যে আবার অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ রয়েছে। 'রাব' হলে যেমন তাঁকে সৃষ্টিকর্তা বিবর্তনকারী ও পালনকর্তা হতে হবে তেমনি তাঁকে বিচারপতিও হতে হবে, তাঁকে দয়ালুও হতে হবে। ন্যায়বিচারক হলে এ দুনিয়ার সকল জীবের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি থাকতে হবে, যাতে সকল জীবই আহার লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। মানুষের বেলায় শোষক ও শোষিত বলে কোন বিশেষ শ্রেণী থাকবে না। এ দুনিয়ার সম্পদ যাতে এ দুনিয়ার সকল মানুষই সমানভাবে ভাগ করে ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই সমাজ ব্যবস্থা সাম্যবাদমূলক হবে এটাই যুক্তিযুক্ত।

৩.১.৫ জিহাদ

জিহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম বা অবিরাম চেষ্টা বা সাধনাতে লিপ্ত হওয়া। আর সাধারণত ইসলামকে এ বিশ্বে টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হওয়াকে জিহাদ নামে অভিহিত করা হয়। তবে এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মানবজীবনকে সুন্দর, সরল ও মঙ্গলময় পথে পরিচালনা করার যতগুলো প্রতিবন্ধক রয়েছে – তার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করাই জিহাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য[৬৫] সংগ্রাম ব্যক্তিবিশেষের জীবনে (ক) প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে যেমন হতে পারে, (খ) তেমনি তার দৈহিক নিরাপত্তার জন্য আততায়ীর বিরুদ্ধেও হতে পারে, (গ) স্বীয় এবং সামাজিক আর্থিক বিধানের বিরুদ্ধেও হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে, (ঘ) মানবজীবনের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও হতে পারে এবং (ঙ) নাফস ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও হতে পারে জিহাদ। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এর মতে, "প্রকৃত জিহাদ ও রাজ্য জয়ের মধ্যে পার্থক্য করা দরকার"[৬৬] জিহাদের অর্থ ভিন্ন মতাবলম্বী লোকের উপর আঘাত হানা নয়, যারা আল্লাহ্‌র রাজ্যে ভেদাভেদের প্রবর্তন করে, আল্লাহর নেয়ামত যারা দু'হাতে লুটে নেয়, মানুষের মানবিক অধিকারগুলো যারা স্বীকার করে না, মানুষকে যারা সৃষ্টির সেরা জীব বলে স্বীকার করেনা। তারাই ইসলাম বিরোধী তাদের সাথেই করতে হবে জিহাদ।[৬৭] ইসলামি বিপ্লব তাই "নর হত্যার বিপ্লব নয়, সে বিপ্লব আদতে আত্মিক বিপ্লব অবস্থাভেদে তা রক্ত বিপ্লবের রূপও নিতে পারে।"[৬৮] বলা বাহুল্য, এ রক্তাক্ত বিপ্লব ভিন্ন মত পোষণের জন্য নয়, বরং অবিচার ও অন্যায় প্রতিরোধের পথে প্রতিবন্ধকতাকারীরে বিরুদ্ধে এবং তা কেবল যতক্ষণ এবং যতটা প্রয়োজন।

৩.১.৬ নারীর মর্যাদা

ইসলামী দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে নর-নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু অতীতে অনেক নারীকে ভীষণভাবে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। বিশেষ করে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে নারীদের প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এ ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা ধারাকে ইসলামের মূল চেতনা বিরোধী বলে মনে করেন। তিনি বলেন: "ইসলামের দৃষ্টিতে নারী পারমার্থিক উন্নতির পক্ষে প্রতিবন্ধক নয় বরং অত্যন্ত দৃঢ় সহায়ক। এ জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেন,-'আল নিকাহু নিসফুল ঈমান' নিকাহ বা বিবাহ্ ঈমানের অর্ধেক।"[৬৯]

৩.১.৭ খলীফার দায়িত্ব

তৎকালীন খলীফাগণ নিজেদেরকে কখনও শাসক মনে করতেন না। সর্বদাই নিজেদেরকে খাদেম মনে করতেন। সাধারণের অর্থ খলীফার তত্ত্বধানে থাকলেও তা থেকে যথেচ্ছ ব্যয় করার অধিকার খলীফার ছিলনা। কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহের উদ্রেক হলে জনসাধারণের পক্ষে প্রকাশ্যে খলীফার সমালোচনা করার অধিকার ছিল। তাদের

Dhaka University Institutional Repository

অপসারণ করা ছিল খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার। এর উদাহরণ রয়েছে ইসলামের স্বর্ণ যুগের ইতিহাসে। খলীফা উসমানের খিলাফত আমলে কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপণ করলে তিনি মুসলিমদের সাধারণ সভা ডেকে তাঁর উপর আরোপিত অভিযোগ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বলেন, "আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বলছি–আমি কোন শহরের উপর তার সাধ্যাতীত কর ধার্য করিনি, কাজেই আমার বিরুদ্ধে আনীত এ অভিযোগ নিছক মিথ্যা। আমি সর্ব সাধারণের কাছ থেকে যা গ্রহণ করছি তা তাদেরই হিতের জন্যই ব্যয় করছি। যে লভ্যাংশের এক-পঞ্চমাংশ আমার নিকট এসেছে তাও আমার ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ব্যয় করা আইন সঙ্গত নয়। তাই তার সমস্তই মুসলিমরা ব্যয় করেছে –আমি করিনি। সাধারণ কোষাগারের এক কপর্দকও অপব্যয় করা হয়নি, আমি তা থেকে একটি পয়সাও নিইনি। আমি আমার উপার্জনের উপরই নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করি।" এ থেকেই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, খোলাফায়ে রাশেদার যুগে খলীফাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল জনগণের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সুষ্ঠুভাবে তাদের মধ্যে বণ্টন করা। এক কথায় বলা যায় প্রজাদের প্রতি পালনই ছিল তাদের ধ্যান ও জ্ঞান।

৩.১.৮ অর্থনীতি

ইসলামী খিলাফতের অর্থনীতি পরিচালিত হয় সর্বসাধারণের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে। যুদ্ধলব্ধ বিত্ত (আর-গানীমাহ্), যাকাত, সাদাকা, জিযিয়া, খিরাজ, আল-ফায়, আল-উশর প্রভৃতি কর ধার্য করে এ রাষ্ট্রের বায়তুল মাল গড়ে তোলা হয় । হযরত উমর (রা.) এর লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের সমস্ত মুসলিম অধিবাসীকে রাষ্ট্রের অঙ্গ জ্ঞান করে রাষ্ট্রগত প্রাণকরে তোলা। সেজন্য তিনি রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তি নির্ধারণ করেছিলেন এবং তারা যাতে অন্য কোন পেশায় লিপ্ত না হয় সে জন্য কড়া দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর খিলাফতের সময় কোন অমুসলিম মুসলমান হয়ে গেলে তার সম্পত্তি দেশের লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হতো।

এ রাষ্ট্রে যাতে কোন অবস্থায় কোন লোকের হাতে পুঁজি সঞ্চিত না হয় সে জন্য কঠোর নির্দেশ ছিল: এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, "এবং যারা সোনারূপা সঞ্চয় করে,

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেনা–তাদের নিকট এক কষ্টদায়ক শাস্তি ঘোষণা করে দাও।"[৭০] এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেন, সাহাবী আবু হোরায়রা (রা.) তা বর্ণনা করেন, "রোজ কিয়ামতে এ সকল লোকদের পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে।" সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনে হাজম জাহেরী 'মুহাল্লা'য় উল্লেখ করেছেন –হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল (স.)বলেছেন, "যে ব্যক্তির কাছে শক্তি ও সামর্থ্যের সরঞ্জাম নিজ আবশ্যকের অতিরিক্ত রয়েছে তার উচিত–ঐ অতিরিক্ত সামান-সরঞ্জাম দুর্বলকে দান করা। যে ব্যক্তির কাছে খাওয়া-পরার অতিরিক্ত উপাদান রয়েছে তার পক্ষে উচিত – অতিরিক্ত সামান দীন-দুঃখীকে দান করা।" আবু সাঈদ খুরদী (রা.) আরও বলেন, "নবী কারীম (স.) এভাবে নানা প্রকারের উল্লেখ করেছেন তাতে আমার এরূপ ধারণা জন্মেছে যে, আমাদের মধ্যে কারো কোনো প্রকারের মালের দাবি থাকতে পারে না।"[৭১]

হযরত রাসূলে কারীম (স.)-এর প্রধান সাহাবী ও ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় হযরত আলী (রা.) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌ তা'আলা ধনীদের ওপর গরিবদের আবশ্যকীয় জীবিকা পরিপূর্ণভাবে সরবরাহ করা ফরয করেছেন। যদি তারা (গরিবেরা) ভুখা, নগ্ন থাকে অথবা জীবিকার জন্য বিপদগ্রস্থ হয় তাহলে ধনীরা দায়িত্বশীল নয় বলেই বুঝতে হবে–এজন্য আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে এবং সংকীর্ণতার জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। আরও নানাবিধ হাদিস ও কুরআনের দলীলের দ্বারা মুহাদ্দিস ইবনে হাজম এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করে বলেছেন– "প্রত্যেক মহল্লার ধনীদের ওপর গরিব-দুঃখীদের জীবিকার জন্য দায়ী (জামিন) হওয়া ফরয (অবশ্য কর্তব্য)। যদি বায়তুলমালের আমদানি ঐ গরিবদের জীবিকার সরবরাহের জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে শাসক বা আমীর ধনীদিগকে এ কাজের জন্য বাধ্য করতে পারেন অর্থাৎ তাদের মাল জোরপূর্বক গরিবদের প্রয়োজনে খরচ করতে পারেন। তাদের জীবিকার সংস্থানের জন্য কমপক্ষে অত্যাবশ্যক প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষুধায় খাদ্য, পরিধানের বস্ত্র এবং ঝড়বৃষ্টি, রোদ-গরম ও প্লাবন থেকে রক্ষা করতে পারে এমন বাসগৃহ।"[৭২]

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে বিত্ত সঞ্চয় বা শোষণের কোন সুযোগই থাকতে পারে না। রাষ্ট্র ও জনসাধারণ ব্যতিরেকে তৃতীয় কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সংস্থা থাকতে পারেনা। ইরাক ও সিরিয়া বিজিত হওয়ার পর সাহাবীদের শত অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও হযরত উমর ফারুক (রা.) তাদের জায়গীর দান করেন নি বরং সমস্ত ভূমি সরকারের অধীনে রেখে তার সমূদয় আয় সকল অধিবাসীদের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে ওয়াকফ্ গণ্য করেছেন। এমন কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি যাতে কোন জোতদারের হাতে না থাকে এ জন্য হযরত বিলাল (রা.) এর জায়গীর থেকেও অতিরিক্ত জমি কেড়ে নিয়ে হযরত উমর ফারুক (রা.) প্রকৃত চাষীদের মাঝে বণ্টন করে দেন। কাজেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখে যাতে সর্বাবস্থায় সমান অংশে দুনিয়ার সম্পদ মানুষ ভোগ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মানবের কর্ম প্রয়াস চালিত হওয়া উচিত।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দর্শনের ভিত্তি তাওহীদী জীবনবোধ। এর ফলশ্রুতি অখণ্ড মানবতাবাদ। তাওহীদ দর্শন অনুযায়ী মহান আল্লাহ্ই এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা, বিধানদাতা ও পালনকর্তা। তিনি সব মূল্যমানের মূল উৎস এবং সব কিছুর সংরক্ষণকারী। সমস্ত মানুষকে তিনি একই পিতা-মাতা থেকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষে মানুষে যে কিছু সৃষ্টিগত পার্থক্য দেখা যায়, সেটি পারস্পরিক পরিচয় ও বৈচিত্র্যের জন্য, অনৈক্য, বিভেদ ও সংঘাতের জন্য নয়। তাঁর মতে মানুষ আল্লাহ্র প্রতিনিধি। কেবল দৈহিক বা আকৃতিগত দিক দিয়ে সামঞ্জস্য থাকলেই একজন প্রকৃত মানুষ হয় না। মনুষ্যত্ব সাধনার মাধ্যমে অর্জন করে মানুষ হতে হয়। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন বিভিন্ন প্রতিকূল শক্তি ও বৃত্তির সাথে সংগ্রাম করে আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হয়ে প্রকৃত পূর্ণ মানুষ বা ইনসান-ই কামিল হতে হয়। আর এরূপ মানুষ হয় সবার প্রিয়, সবার জন্য উপকারী কল্যাণকামী।

Dhaka University Institutional Repository

৪. প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম

প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর তাঁর উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্রের সহযোগীতায় ভাষা আন্দোলনের এ জনক সংগঠন 'পাকিস্তান তমুদ্দুন মজলিস' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনিই ছিলেন তখন তমুদ্দুন মজলিসের মূল সংগঠক। প্রথম থেকেই এ মজলিসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম (পরবতীকালে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট) জনাব শামসুল আলম ও জনাব ফজলুর রহমান ভূঁইয়া। পরে জরিত হন আজিজ আহমদ, অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া, নঈমুদ্দীন, সানাউল্লাহ্ নূরী প্রমুখ।

তমুদ্দুন মজলিস সম্পর্কে জনাব সানাউল্লাহ্ নূরী বলেন, "ঢাকায় পাকিস্তানের পতাকা উঠার ষোল দিন পর জন্ম হয় এ অরাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সংগঠনটির। বাংলা ভাষার পক্ষে ছাত্র, বুদ্ধিজীবী এবং জনগণের স্তরে জাগরণের ক্ষেত্রে তমুদ্দুন মজলিস পালন করেছিল এক বিপ্লবী ও অনন্য ভূমিকা।"[৭৩]

এ সম্পর্কে মোহাম্মদ তোয়াহা বলেন, "বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা যায় কিনা এ নিয়ে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে চিন্তার সূত্রপাত করে তমুদ্দুন মজলিস। এই তমদ্দুন মজলিস ছিল একটি ইসলামী আদর্শবাদী সাংস্কৃকি প্রতিষ্ঠান।" অধ্যাপক আবদুল গফুর বলেন, "ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্বে নেতৃত্ব দেন তমুদ্দুন মজলিস যা ছিল একটি ইসলামী আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠান।"

বস্তুত, প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম ভাষা আন্দোলনের জনক সংগঠন, তমুদ্দুন মজলিসকে প্রগতিশীল ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার জন্য জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট মেধা, সময়, ও অপরিমিত শ্রম নিয়োজিত করেছিলেন। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলার' প্রশ্নটি যেমন ছিল তার কাছে 'দিবা রাত্রির স্বপ্ন' তেমনি সে স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন তমদ্দুন মজলিসকে। আদর্শবাদী তরুণদের খুঁজে বের করে তমুদ্দুন মজলিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এ তরুণ অধ্যাপক সাইকেলে চড়ে নিরন্তর ছুটে বেড়াতেন ঢাকা নগরীর প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সাহিত্য সংস্কৃতির আড্ডায়, যুব সম্মেলনে ও রাজনৈতিক ক্যাম্প। এমনিভাবে ছুটে বেড়িয়ে তিনি সর্ব জনাব শামসুল আলম, সানাউল্লাহ্ নূরী, শাহেদ আলী প্রমুখের মত অসংখ্য নেতা ও কর্মীকে তমুদ্দুন মজলিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে একে একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন।

প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের ভাষায়, 'পাকিস্তান তমুদ্দুন মজলিস আদর্শবাদী কর্মীদের বৈজ্ঞানিক সংগঠন। চিন্তাবিপ্লব ও সাংস্কৃতিক উজ্জীবন মারফত সর্ব মানবীয় কল্যাণ ধর্মী আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েমই মজলিসের লক্ষ্য ছিল।' তমুদ্দুন মজলিসের প্রথম গঠনতন্ত্রে যে চারটি উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে তা উল্লেখ করলেই আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হবে যে, তমুদ্দুন মজলিস মূলত রাবুবিয়াত দর্শন বা বিশ্ব পালনবাদী নীতির আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত এক আদর্শবাদী সংগঠন।

তমুদ্দুন মজলিসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-

(ক) 'কুসংস্কার গতাণুগতিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা' দূর করে 'সুস্থ ও সুন্দরতম তমদ্দুন গড়ে তোলা,

(খ) যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাঙ্গ সুন্দর ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদের দিকে মানব সমাজকে এগিয়ে নেওয়া।

(গ) মানবিক মূল্যবোধের উপর সাহিত্য ও শিল্পের মারফত নতুন সমাজ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।

(ঘ) নিখুঁত চরিত্র গঠন করে গণজীবনের উন্নয়নে সহায়তা করা।

চিন্তা বিপ্লব ও সাংস্কৃতিক উজ্জীবন মারফত সর্ব মানবীয় রাবুবিয়াতের আদর্শে লালিত ও উজ্জীবিত মানব কল্যাণ ধর্মী আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েমই যে মজলিসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল তা এ মজলিসের মর্মবাণীর প্রতি দৃষ্টি দিলেই তা আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠবে–

Dhaka University Institutional Repository

তমুদ্দুন মজলিসের মর্মকথা-

১. তমুদ্দুন মজলিস বিশ্বাস করে যে একমাত্র খাঁটি ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বর্তমান সমস্যা জর্জরিত ও সামাজিক বৈষম্যময় পৃথিবীতে কল্যান ও শান্তি আসতে পারে।

২. তমুদ্দুন মজলিস বর্তমান যুদ্ধ, হানা-হানি ও মানবতাবিরোধী সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে সমাজ হবে ইসলামী আদর্শের আলোকে প্রতিষ্ঠিত।

৩. তমুদ্দুন মজলিস মানবীয় মূল্যবোধের উপর সাহিত্য, শিল্প ও কাজের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

৪. গণজীবনে মনবিপ্লব সাধন করে খাঁটি ইসলামী আদর্শের দিকে মানুষকে এগিয়ে দেওয়াই মজলিসের আশু উদ্দেশ্য।

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, রাবুবিয়াত বা বিশ্ব পালনবাদী আদর্শে উজ্জিবিত হয়েই তৎকালীন সময়ে অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে তমুদ্দুন মজলিস গঠিত হয়েছিল। তমুদ্দুন মজলিসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল রাবুবিয়াতের ভিত্তিতে পালনবাদী সমাজ গড়ে তোলা।

৫. অধ্যাপক শাহেদ আলী

মহান ভাষা সৈনিক, বরেণ্য কথাশিল্পী, তাত্ত্বিক, দার্শনিক, বাংলা সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র অধ্যাপক শাহেদ আলী ১৯২৫ সালের ২৬ মে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর থানার মাহমুদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী মূখপত্র সাপ্তাহিক 'সৈনিক পত্রিকা'র সম্পাদনা করেন।

তিনি ১৯৫৪ সালে অধ্যাপনা পেশা ছেড়ে রাজনীতিতে যোগদান করেন। তিনি যুক্তফ্রন্ট ও মুসলিম লীগের প্রার্থীকে পরাজিত করে খেলাফতে রাব্বানী পার্টি থেকে পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি নির্বাচনে প্রচারণার সময় বিভিন্ন এলাকায় রাব্বানী পার্টির আদর্শ ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনেকে প্রশ্ন করেন রাব্বানী পার্টির

Dhaka University Institutional Repository

নাম আগে শুনিনি এর অর্থ কি? এ পার্টি কি করতে চায় ? তিনি উত্তরে বলেন, "এটা একটি আদর্শবাদী আন্দোলন। এ পার্টি বিশ্বাস বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। সকল মানুষ ও প্রাণীকুলের এতে হক রয়েছে। কাউকেই তার ন্যায্য হক থেকে বঞ্চিত করা যাবেনা। আল্লাহর সূর্যের আলো আমরা সমানভাবে ভোগ করি। তাঁর পানি ও বাতাসেও রয়েছে আমাদের সকলের সমান অধিকার। তেমনি তাঁর জমিনেও রয়েছে সকল মানুষের ন্যায্য হক। রাব্বানী পার্টিতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল মানুষের রয়েছে মুক্তির প্রতিশ্রুতি। রাব্বানী পার্টি আপনাদের সহযোগীতায় সে হকই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ পার্টি সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি ও শোষণ বঞ্চনার হাত থেকে সকল মানুষকে মুক্ত করতে চায়। এ আন্দোলন আসলে জনতার আন্দোলন। তিনি বলতেন, খালিস নিয়তে এ আন্দোলনে শরীক হোন। আল্লাহ্ আপনাদের এ জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে দিবেন সুখ-শান্তি। মানুষে মানুষে ভেদাভেদের আমরা মূলেচ্ছেদ করতে চাই, এটাই রাব্বানী পার্টির মিশন।

রাব্বানী পার্টির প্রচারনায় অধ্যাপক শাহেদ আলী বলেন,আমাদের বিশ্বাস আমরা যদি সততার সঙ্গে কাজ করে যাই, তার ঢেউ মানুষের অন্তরে লাগবেই। আমরা আশাবাদী আল্লাহর দলের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। আমি আশাকরি এ দল আপনাদের সাহায্যের দাবীদার। কারণ এ দল, যারা সৎ রাজনীতি চায়, সকল প্রকার কলুষতার ঊর্ধ্বে উঠে মাখলুকের খেদমতে আত্মনিবেদন করতে চায়, এ পার্টি তাদেরই পার্টি। এভাবে তিনি বিভিন্ন জনসভায় রাব্বানী পার্টির উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন ভাল দিকগুলো তুলে ধরে ভোট প্রার্থনা করতেন। পরবর্তীতে ভোটের ফলাফলে দেখা গেল, খেলাফতে রাব্বানী পার্টি নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। এভাবেই অধ্যাপক শাহেদ আলী 'রাবুবিয়াত'এর বা বিশ্ব পালনবাদী আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে সাধারণ মানুষের জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে খেলাফতে রাব্বানী পার্টিতে যোগ দিয়ে আজীবন রাব্বানী পার্টির আদর্শের কথা প্রচার করে গেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ৬৩৩

২. আবু জাফর শামসুদ্দিন, *দৈনিক সংবাদ*, ২২নভেম্বর, ১৯৭৬

৩. ব্যারিস্টার প্রমথ নাথ মিত্র ১৯০১-১৯০২ সালের দিকে কলকাতায় অনুশীলন সমিতি নামে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে এই সমিতির অনেকগুলো শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, সতীশচন্দ্র বসু, বিপিন চন্দ্র পাল, যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র মল্লিক, সরলা দেবী চৌধুরানী, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনুশীলন সমিতির সদস্যরা ভারতবর্ষে অবস্থানরত ইংরেজ কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। ১৯০৫ সারে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অনুশীলন সমিতির কার্যক্রম তীব্র আকার ধারণা করে।

অনুশীলন সমিতির সঙ্গে মতভেদ ঘটায় যুগান্তর দলের সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতি একই সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হলেও ১৯০৮ সালে আলিপুর ষড়যন্ত্রমামলার পর থেকে যুগান্তর আলাদাভাবে পরিচালিত হয়।

৪. আনিসুজ্জামান মানিক, *মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবনদর্শন*, 'দর্শন ও প্রগতি', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা : জুন-ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ.১২৭

৫. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, *মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী*, ঢাকা : ঝিনুক প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ৫৯১

৬. প্রাগুক্ত, পৃ.১২৭

৭. আবু জাফর শামসুদ্দিন, *দৈনিক সংবাদ*, ২২ নভেম্বর, ১৯৭৬

৮. দৈনিক সংবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

৯. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-১৫০

১০. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১১. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ঢাকা ১৯৮৫, ১ম খন্ড, পৃ.৫৪১

১২. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, *রাবুবিয়াতের ভূমিকা*, হুকুমাতে রাব্বানীয়া সমিতি প্রকাশনী, সন্তোষ, বাংলাদেশ, ১৯৭৪. পৃ.১-২

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

১৪. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪১

১৫. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৩

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৫

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৬

১৮. প্রাগুক্ত পৃ. ৬–৭

১৯. প্রাগুক্ত পৃ. ১১–১২

২০. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ,ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : *দর্শন ও কাঠামো* সৈয়দ ইরফানুল বারী সংকলিত, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সিরিজ, সন্তোষ, ১৯৭৮, পৃ.২

২১. অধ্যাপক হাসান আবদুল আইয়ূম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬০

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬১

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬১

২৪. প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৬২

২৫. আবুল হাশিম, *রব্বানী দৃষ্টিতে*, ঢাকা : আবুজর গিফারী সোসাইটি, (সন উল্লেখ নেই) পৃ.৬৭

২৬. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৪

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৮

২৮. আবুল হাশিম, *রব্বানী দর্শন*, ঢাকা: আবুজর গিারী সোসাইটি, 'ভূমিকা'

২৯. ঐ

৩০. আবুল হাশিম, *ইসলামের মর্মকথা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ১১

৩১. ঐ

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. *আল-কুরআন*, ৩০:৩০

৩৪. আবুল হাশিম, *ইসলামের মর্মকথা*, পৃ. ২১

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৩৬. *আল-কুরআন*, ১০৭:১-৭

৩৭. আবুল হাশিম, *রব্বানী দৃষ্টিতে*, পৃ. ২৪

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

৪১. আবুল হাশিম, *ইসলামের মর্মকথা*, পৃ. ৫৩

৪২. আবুল হাশিম, *রব্বানী দৃষ্টিতে*, পৃ. ৯০

৪৩. আবুল হাশিম, *ইসলামের মর্মকথা*, পৃ. ৫৪

৪৪. আবুল হাশিম, *রব্বানী দৃষ্টিতে*, পৃ. ৯২

৪৫. Abul Hasim, *As I see it*, Dhaka: Islamic Academy, 1965, p. 48

৪৬. আবুল হাশিম, *রব্বানী দৃষ্টিতে*, পৃ. ৯৫

৪৭. Abul Hasim, *As I see it*, p. 38

৪৮. মো: রফিকুল ইসলাম, *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ*, ঢাকা : মোশরোজ কিতাব মহল, ২০০২, পৃ. ৫৯

৪৯. সোহেলা সোব্হান, *মানবতাবাদী দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ*, 'বাংলাদেশ দর্শন সমিতির পত্রিকা', ঢাকা : জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ.২৭

৫০. আনিসুজ্জামান, *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : একজন জীবন ঘনিষ্ঠ দার্শনিকের প্রতিকৃতি*, 'বিশ্বদর্শন দিবস বিশেষ সংকলন', দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়. ঢাকা ; ২০০৮, পৃ. ১০৯

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৫২. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে*, ঢাকা : ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০. পৃ. ৫-৬

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *অতীত জীবনের স্মৃতি*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৭, পৃ. ২২০

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

৫৫. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলা*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬, পৃ. ৭৭

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৫৭. *আল-কুরআন* ২ : ১১০

৫৮. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম*, পৃ. ৭৮

৫৯. *আল-কুরআন* ২ : ১৮৩

৬০. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮

৬১. *আল-কুরআন*, ২২ : ২৬

৬২. প্রাগুক্ত, ২২:২৬

৬৩. প্রাগুক্ত, ২২:২৭

৬৪. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮২

৬৫. প্রাগুক্ত ,পৃ. ৮৩

৬৬. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *ইসলামী আন্দোলন যুগেযুগে*, পৃ. ৫-৬

৬৭. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন দর্শনের পুনর্গঠন*, ঢাকা : ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০. পৃ. ৬৮-৬৯

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৭০. *আল-কুরআন* ৯ : ৩৪

৭১. উদ্ধৃত. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম*, পৃ. ১০২

৭২. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৭৩. সানাউল্লাহ্ নূরী, *চল্লিশ দশকের রাজনীতি ও ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি*, 'ঐতিহ্য', ১ম বর্ষ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯২

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সাম্যবাদী দর্শনের সাথে রাবুবিয়াত দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা

স্বাধীনতা ও সাম্য এ দুটো ধারণা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ক্ষমতা-সৃষ্ট কৃত্রিম সুযোগ-সুবিধা মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বৈষম্যের সৃষ্টি করে যা মানবাত্মার বিকাশকে ব্যাহত করে। গণতন্ত্র, সমাজবাদ, এবং কমিউনিজম সকলেই এ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে এবং প্রত্যেকটিই এরূপ সমস্যার সমাধান দিতে পারে বলে দাবী করে।

ফরাসী বিপ্লববাদীরাও দাবী করেছিল স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্যের কথা। ম্যাসাচুসেটের অধিকার-বিল এবং আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে একটা স্বতঃপ্রমাণ সত্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়। টমাস জেফার্সনও বলেছিলেন, "আমরা এই সত্যগুলোকেই স্বতঃপ্রমাণ সত্য হিসেবে বিশ্বাস করি যে, সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন।" আব্রাহাম লিংকনও তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা সমূহে এই বিশ্বাসেরই পুনরুল্লেখ করে বলেছিলেন, "আমি এই আশা নিয়েই আপনারদেরকে ছেড়ে যাচ্ছি যে, স্বাধীনতার দীপশিখা ততদিন পর্যন্ত আপনাদের অন্তরে জ্বলতে থাকবে, যতদিন না এ সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহও সৃষ্টি হয় যে, সব মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন ও সমান।" বিশ্বের সকল মহান চিন্তাবিদ এবং মহান সংস্কারকেরা সাম্যেরবাণী প্রচার করলেও সাম্যের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় ইসলামে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ইসলামী তথা রাবুবিয়াত দর্শনের সাথে সাম্যবাদী দর্শন তথা কমিউনিজম বা মার্কসীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করবো। এ লক্ষ্যে প্রথমে সাম্যবাদী দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করবো। অতঃপর ইতিপূর্বে আলোচিত রাবুবিয়াত দর্শনের সাথে এর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উল্লেখ্য করে তুলনামূলক আলোচনায় প্রয়াসী হব।

সাম্যবাদী দর্শন

সাম্যবাদী দর্শন বলতে আমরা সাধারণত মার্কসীয় দর্শনকে বুঝায়। তবে মার্কসীয় দর্শন বলতে কেবল মার্কসের চিন্তাধারাকে বোঝায় না, এর সংগে এঙ্গেলসের নামও

Dhaka University Institutional Repository

ওতপ্রতভাবে জড়িত।[১] মার্কসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এঙ্গেলস মার্কসীয় দর্শনের বিকাশ ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। প্রচলিত দর্শনের সমালোচনা বিশেষ করে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক ভাববাদী ও ফয়েরবাখের যান্ত্রিক বস্তুবাদী দর্শনের সমালোচনার মধ্যদিয়ে মার্কসীয় দর্শনের উদ্ভব হয়েছে। মার্কস ও এঙ্গেলস হেগেল ও ফয়েরবাখের দর্শনের ত্রুটি ও অসংগতিগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেন এবং সেগুলোকে দূর করে এক বিজ্ঞানসম্মত দর্শন রচনা করেন।

হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব হল একটি বিকাশের তত্ত্ব। জগতের গতি ও পরিবর্তন ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি এই তত্ত্ব ব্যবহার করেন। দ্বন্দ্বতত্ত্বের দুটো সাধারণ প্রকৃতি রয়েছে। প্রথমত: জগতের সবকিছুই প্রকৃতিগতভাবে দ্বন্দ্বমূলক বা বিরুদ্ধতাপূর্ণ। দ্বন্দ্ব বা বিরুদ্ধতাই হল জগতের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত: দ্বন্দ্বই সব বিকাশের ভিত্তি, দ্বন্দ্বই বিকাশের চালিকা শক্তি। কিন্তু হেগেলের কাছে বিকাশ মানে পরম ভাবের বিকাশ, প্রকৃতিজগৎ বা বস্তুজগতের বিকাশ নয়। বিকাশের প্রক্রিয়াকে তিনি ব্যাখ্যা করেন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে-নয় (Thesis) প্রতিনয় (Antithesis) ও সমন্বয়ের (Synthesis) পদ্ধতিতে। এ পদ্ধতিতে গতির নিয়মে সত্তা অসত্তায় পরিণত হয় এবং এদুয়ের ধারণার দ্বন্দ্ব থেকে পরম সত্তার উদ্ভব। হেগেলের মতে গতি ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রতেকটি ধারণা থেকে বিরুদ্ধ বা বিপরীত ধারণার উদ্ভব ঘটে এবং ধারণা ও বিরুদ্ধ ধারণার দ্বন্দ্বের সমন্বয়ে ঘটে একটি উচ্চতর ধারণায় বা পরম ধারণায়। তাঁর কাছে দ্বন্দ্ব আসে পরম সত্তা থেকে এবং তা আবার বিকাশ সম্পন্ন করে পরম সত্তায়ই ফিরে যায়। এভাবে জগতের সবকিছুই পরম সত্তার প্রকাশ ও বিকাশ। মার্কস দেখান হেগেলের দর্শনে বিকাশের প্রক্রিয়া থেমে যায় পরম সত্তায়। তিনি হেগেলের দর্শনের মধ্যে স্ববিরোধিতা আবিষ্কার করে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে হেগেল একদিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিকাশের স্বীকৃতি দেন, অন্যদিকে তিনি পরম ভাববাদী দর্শনের মাধ্যমে বিকাশকে থামিয়ে দেন পরম সত্তায়।

Dhaka University Institutional Repository

ফয়েরবাখ হেগেলের ভাববাদকে বর্জন করে বস্তুবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বস্তুবাদ অনুযায়ী, একমাত্র মূর্তপ্রকৃতি এবং এর ভেতরের মূর্ত মানুষই প্রকৃত সত্তা। প্রকৃতির বাইরে আধ্যাত্মিক বা অতিপ্রাকৃতিক সত্তা বলে কিছুই নেই। ফয়েরবাখের এই বস্তুবাদ মার্কসীয় বস্তুবাদের উৎস হিসাবে কাজ করে। ফয়েরবাখের বস্তুবাদ বস্তুকে দেখে নিষ্ক্রিয়, অপরিবর্তনীয় ও আগে থেকে তৈরী করা বিষয় হিসেবে। এই বস্তুবাদ অনুযায়ী বস্তুগতিশীল হয় কেবল যান্ত্রিক কারনে তথা বাহ্যিক কারনে। বস্তুর গতিমানে হল কেবল তার অবস্থানের পরিবর্তন। মার্কস ও এঙ্গেলস ফয়েরবাখের দর্শনের এই যান্ত্রিক পোশাকটি খুলে ফেলেন এবং তাঁর বস্তুবাদকে দ্বন্দ্বতত্ত্ব দিয়ে সমৃদ্ধ করেন। এভাবে হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব ও ফয়েরবাখের বস্তুবাদের গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুযায়ী দর্শনের দুটি মৌলিক দিক রয়েছে-একটি তত্ত্ববিদ্যাবিষয়ক দিক এবং অন্যটি জ্ঞানবিদ্যাবিষয়ক দিক। বস্তুবাদ হল এর তত্ত্ববিদ্যার দিক, আর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হল এর জ্ঞানবিদ্যার দিক বা পদ্ধতির দিক। মার্কসীয় দর্শন বস্তুবাদী এই কারণে যে তা বস্তু বা বাস্তব অবস্থা দিয়ে জগতের ব্যাখ্যা শুরু করে। এ দর্শন দ্বান্দ্বিক এই কারণে যে তা জগতের ব্যাখ্যা দেয় দ্বান্দ্বিক নিয়মে অর্থাৎ গতি ও পরিবর্তরেনর প্রক্রিয়ায়। এককথায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ হল বস্তুজগতের বিকাশের সাধারণ নিয়মের বিজ্ঞান।[২] দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুযায়ী তিনটি সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বস্তুজগত বিকশিত হয়- (১) বিরুদ্ধতার নিয়ম ঃ বস্তু ও ঘটনার সার্বিক প্রকৃতি হল বিরুদ্ধতা অর্থাৎ জগতের সব বস্তু ও ঘটনার মধ্যে বিরুদ্ধতা বর্তমান। আর বিরুদ্ধতা আছে বলেই জগতে গতি ও পরিবর্তন আছে এবং জগতের বিকাশ সম্ভব হচ্ছে; (২) রূপান্তরের নিয়মঃ জগতের সব বস্তু ও ঘটনারই একটি পরিমাণের দিক ও একটি গুণের দিক আছে। এই নিয়ম অনুযায়ী বস্তু ও ঘটনা পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ অস্পষ্ট ও অমৌলিক পরিবর্তন থেকে স্পষ্ট ও মৌলিক পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়; (৩) নেতিকরণের নিয়মঃ জগতের সব বস্তু ও ঘটনার ক্ষেত্রেই নতুনের দ্বারা পুরনো প্রতিস্থাপিত হয়, পুরনোকে নেতি করে বা অস্বীকার করে নতুনের জন্ম হয়। পুরনো অবস্থার অস্বীকৃতি ছাড়া কোন বিকাশই সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

মার্কসীয় দর্শন তথা সমগ্র দর্শনের মৌলিক সমস্যা হরো বস্তু ও চেতনার সম্পর্ক বিষয়ক সমস্যা। অর্থাৎ বস্তু আগে, না চেতনা আগে? মার্কসীয় দর্শন বস্তুবাদী কেননা, মৌলিক সমস্যার সমাধানে এ দর্শন ঘোষণা করে, বস্তুই আগে এসেছে, চেতনা পরে। স্ট্যালিন মতে, "একে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলা হয় কারণ, বস্তুজগতের ঘটনাপ্রবাহের প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গি ও সেগুলোকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করবার পদ্ধতি হলো দ্বান্দ্বিক, আর বস্তুজগতের ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা, সে সম্পর্কে এর ধারণা ও তত্ত্ব হলো বস্তুবাদী।"[৩]

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বস্তুজগৎকে আগে থেকে তৈরি করা কোনো জিনিসের জটিল সমবায় হিসেবে দেখা হয় না। এ দর্শন বস্তুজগতকে নানা প্রক্রিয়ার যৌগিক সমাহার হিসেবে দেখে, যেখানে প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে অবিরাম পরিবর্তনের পথ পরিক্রম করে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুযায়ী, বস্তু সর্বদা গতিশীল অবস্থায় থাকে। গতিই বস্তুর স্বরূপ, তার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য, তার অস্তিত্বের ধরণ। বস্তুতে গতি সঞ্চার হয় কোনো বাহ্যিক শক্তির কারণে নয়, তার অন্তর্নিহিত শক্তির কারণে। সামান্য স্থান পরিবর্তন থেকে শুরু করে চিন্তার পরিবর্তন পর্যন্ত মাহবিশ্বের যাবতীয় পরিবর্তন ও বিকাশের প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে এই গতিশক্তি। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে, জগতে যে অব্যাহত পরিবর্তন ও বিকাশের প্রক্রিয়া চলছে তার অন্তর্গত প্রতিটি বস্তুকে আলাদাভাবে, স্বতন্ত্র একক হিসেবে দেখলে চলবে না, তাকে দেখতে হবে বস্তুসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের ভিত্তিতে।[৪]

মার্কসীয় বস্তুবাদ সমাজ পরিবর্তনের দর্শন। এ দর্শণের মাধ্যমে মার্কস মানুষের মুক্তির দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। মানুষের মুক্তি কেন প্রয়োজন? কারণ মানুষ সামাজিক সংকটে নিপতিত। সামাজিক সংকটের মূলে রয়েছে মানুষে মানুষে সামাজিক বৈষম্য। সামাজিক বৈষম্যের মূলে রয়েছে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা। সার্কসের মতে, সামাজিক বৈষম্য বা সামাজিক সংকট থেকে মুক্তির উপায় হল সমাজের মৌলিক বা গুণগত পরিবর্তন। এই পরিবর্তনই হল সমাজ পরিবর্তন বা সমাজ বিপ্লব। ফয়েরবাখ সম্বন্ধে ১১ নম্বর থিসিসে মার্কস এই পরিবর্তনেরই ইংগিত দেন। তাঁর মতে মানুষের মুক্তির প্রথম পর্যায় হল অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্তি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসমতা দুর করে সমতা প্রতিষ্ঠা করা।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই অর্থনৈতিক মুক্তি বা অর্থনৈতিক সমতা সম্ভব। সামাজিক মালিকানা ভিত্তিক সমাজিক মার্কসের কাংক্ষিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ। কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র হল সমৃদ্ধ মানুষের সমৃদ্ধ সমাজ, এমন এক সমাজ যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের আত্মপোলব্ধি ও আত্মবিকাশের সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। এমন এক সমাজ যেখানে প্রতিটি মানুষ পরস্পর পরস্পরের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে।[৫]

কমিউনিজম সম্বন্ধে মার্কস বিস্তারিত কোন আলোচনা করেননি। "গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা"[৬]-তে তিনি কমিউনিজমের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থাপন করেন। এতে তিনি সমাজিক সমতা বা অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠার একটি নীতি প্রণয়ন করেন। এই নীতিটি হল বন্টণের নীতি। মার্কস বন্টণের নীতির দুটো পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্যায়টি হল অন্তবর্তীকালীন পর্যায়। এ পর্যায়ে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব থাকবে। সম্পত্তিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকবে এবং কাজ অনুযায়ী বন্টণ হবে। দ্বিতীয় পর্যায় হল শেষ বা চূড়ান্ত পর্যায়। এ পর্যায়টি হবে সমবায়ভিত্তিক সমাজ। এ পর্যায়ে সম্পত্তিতে সামাজিক মালিকানা থাকবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বন্টন হবে। কমিউনিজমের এ চূড়ান্ত পর্যায়টি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মার্কসের স্বপ্ন। মার্কসের কমিউনিজমের গভীর মানবিক তাৎপর্য রয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি শোষণ ও বিচ্ছিন্নতার সমস্যা থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদী সমাজের বিপরীতে কমিউনিজম একটি সহযোগিতামূলক সমাজ। পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতা মানুষে-মানুষে শত্রুতা ও বৈরীতার সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এর বিপরীতে কমিউনিজমের সহযোগিতা মানুষে-মানুষে সৌহার্দপূর্ণ মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথা বলে।

ধর্ম ও নৈতিকতা

স্থায়ী ও চিরন্তন এক আধ্যাত্মিক বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাসই হল ধর্ম। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার প্রবক্তারা (মার্কস, এঙ্গেলস) এই বিশ্বাসের মূলে আঘাত করেন এবং চিরন্তনতার ধারণাকে নাকচ করে দেন। এঙ্গেলসের মতে, 'সমস্ত ধর্মই আর কিছুই

Dhaka University Institutional Repository

নয়, যেসব বহিঃশক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের মনে সেগুলোর উদ্ভবট প্রতিচ্ছায়া, যে প্রতিচ্ছায়ায় পার্থিক শক্তিগুলো ধারণ করে অতি প্রাকৃতিক শক্তি রূপে।

মার্কসবাদীদের মতে, ধর্ম এক উদ্ভব অতিমানব সত্তায় বিশ্বাস; ইহ লোকের বাইরে এক পারলৌকিক সত্তায় বিশ্বাস। মূর্ত জগতের বাইরে এক বিমূর্ত সত্তায় বিশ্বাস। মানুষ নিজেই এই বিমূর্ত অতিমানব সত্তার ধারণা তৈরি করে, নিজের সত্তাকে সে হারিয়ে ফেলে এই বিমূর্ত ধারণার মধ্যে।[৭] মানুষ হল মূর্ত জগৎ, মূর্ত সমাজের অন্তর্ভুক্ত সত্তা। এই মূর্ত জগৎ, মূর্ত সমাজই সৃষ্টি করে ধর্ম। ধর্মে যুক্তির কোন স্থান নেই। অতিমানব সত্তায় বিশ্বাসের পেছনে রয়েছে মানুষের ভাবাবেগপ্রসূত ধ্যান-ধারণা। যুক্তিহীন ভাবাবেগপ্রসূত ধ্যান-ধারণা থেকে ভ্রান্ত-চেতনার জন্ম। ধর্ম এমনই এক ভ্রান্ত-চেতনা, যা স্বর্গ-মর্তের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। ধর্মে স্বাধীন বিচারশক্তি বলে কিছুই নেই, স্বতস্ফূর্ত জিজ্ঞাসা ও সংশয় পরখ করার কোন উপায় নেই। আছে কেবল এক বিমূর্ত সত্তা ও তার সাথে সম্পর্কিত কতিপয় ভ্রান্ত ধারণায় অন্ধ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় অবস্থানে রযেছে ঈশ্বরের ধারণা।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাকে ভ্রান্ত বলে নাকচ করে দিয়েছে এই যুক্তিতে[৮] যে, আদিম পরিবেশে নানা ধরণের ভয় যেমন- নিরাপত্তাহীনতা, অসহায়ত্ব, মৃত্যুভয় ইত্যাদি থেকে ঈশ্বরের ধারণার উদ্ভব। মার্কস ও এঙ্গেলস তাদের বিভিন্ন রচনায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, মানব বিকাশের একেবারে গোড়ার পর্বগুলোতে প্রকৃতির শক্তিগুলোর সংগে সংগ্রামে আদিম মানুষের অসহায়বোধ থেকে দেখা দিয়েছিল ধর্ম বিশ্বাস। অর্থাৎ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আদিম মানুষের অক্ষমতা থেকে ধর্মের উদ্ভব। তাদের মতে আদিম মানুষের মৃত্যুভয় যেমন আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস জাগিয়ে মানসিক মুক্তির পথ উন্মুখ করেছিল, ঠিক তেমনি অর্থনৈতিক শোষণে জর্জরিত আধুনিক সমাজের নি:স্ব মানুষ ধর্মের মধ্যে মানসিক মুক্তির পথ খুঁজে বেড়ায়। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে ধর্মের শেকড় শক্তভাবে প্রোথিক আছে শ্রমজীবী মানুষের শোখণের মধ্যে। লেলিনের মতে, ধর্ম হল পুঁজির অন্ধ শক্তি। আবার মার্কস বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম হল নিপীরিত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়,
ঠিক যেমন সেটা হল আত্মাবিহীন পরিবেশের আত্মা।
ধর্ম হল জনগণের জন্য আফিম।[৯]

সাম্যবাদী দর্শন তথা ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা নৈতিকতা সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার বিরোধী। প্রচলিত নীতিদর্শন শাশ্বত বা চিরন্তন নৈতিক নিয়মের দাবি করে। বস্তুবাদী ধারণা এই দাবিকে নাকচ করে দেয়। এ ধারণা অনুযায়ী, জগৎ পরিবর্তনশীল এবং জগৎ সম্পর্কিত ধারণাও পরিবর্তনশীল। কাজেই স্থায়ী বা চিরন্তন কোন নৈতিক নিয়ম জগতে থাকতে পারেনা।[১০] মার্কস নৈতিকতা সম্পর্কে আলাদা কোন তত্ত্ব না দিলেও তাঁর পুঁজিবাদী শোষণের সমালোচনায় দেখা যায় যে তিনি প্রচলিত নৈতিক ধারণা তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে উদ্ভত নৈতিক ধারণার বিরোধিতা করেন। তার মতে পুঁজিবাদ একটি শোষণমূলক ও দাসত্বমূলক ব্যবস্থা এবং প্রচলিত নৈতিক ধারণা এই ব্যবস্থার পক্ষে মতাদর্শিক হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। আবার প্রচলিত নীতিবিজ্ঞানীরা নৈতিক আদর্শ বা মানদণ্ড দিয়ে মানুষের সামাজিক আচরণের ব্যাখ্যা করে থাকেন। মার্কস এর বিরোধিতা করে বলেন সমাজ জীবনের শুরু বৈষয়িক উৎপাদন দিয়ে, বৈষয়িক উৎপাদনই সমাজ জীবনের ভিত্তি এবং এই বৈষয়িক উৎপাদনের নিয়ম অনুযায়ীই সমাজ বিকশিত হয়। সমাজের এই বস্তুগত ভিত্তি থেকেই নীতি, নৈতিকতা ও আদর্শের উদ্ভব। সমাজ এক জায়গায় থেমে থাকে না, পরিবর্তিত হয়। ফলে নীতি, নৈতিকতা, আদর্শ ইত্যাদিও পরিবর্তিত হয়। কাজেই চিরন্তন নৈতিক নিয়ম অর্থাৎ সব দেশে সব কালে একই রকম নৈতিক নিয়ম থাকতে পারে না। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, স্বাধীনতা, অধিকার এসব ধারণাগুলো স্থায়ী নয়, সমাজের বাস্তব অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে এগুলোও পরিবর্তিত হয়। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী, সমাজের বস্তুগত ভিত্তি হল অর্থনীতি এবং এই অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে উদ্ভূত একটি উপরিকাঠামোগত দিক হল নৈতিকতা।[১১] অর্থাৎ কোনো সমাজের নৈতিকতা তার অর্থনৈতিক কাঠামো বা উৎপাদন পদ্ধতির অনুরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

তুলনামূলক আলোচনা

সাম্যবাদী দর্শন তথা মার্কসীয় দর্শন এবং রাবুবিয়াত দর্শনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও অনেক বিষয়ই তাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য রেয়েছে। নিম্নে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

সাদৃশ্যসমূহ

১. উভয় দর্শনের লক্ষ হল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

২. উভয় দর্শন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলে।

৩. উভয় দর্শন সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধী।

৪. উভয় দর্শন সম্পদ পুঁজিপতী তথা ধনিক শ্রেণীর হাতে যাতে জমা না হতে পারে সেদিকে গুরুত্ব আরোপ করে। সাথে সাথে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ যাতে প্রয়োজন মতো সম্পদ ভোগ করতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়।

বৈসাদৃশ্যসমূহ

১. ইসলাম সাম্য ও স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের উপর ভিত্তি করে গঠিত এবং এর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আস্তিক। জীবনের প্রতি সব রকমের দর্শনের ও অস্তিত্বের প্রতি মৌলিক মনোভাবের বিরাট বাস্তব ফলাফল আছে। আমরা দেখেছি যে, গোঁড়া সাম্যবাদী (কমিউনিস্ট) দর্শন হচ্ছে, বস্তুতান্ত্রিক ও নিরীশ্বরবাদী। এর বিরুদ্ধে ইসলাম বিশ্বাস করে যে, জীবনের একটা আত্মিক উৎস, আত্মিক পটভূমি ও আত্মিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধ যান্ত্রিক শক্তি দ্বারা শাসিত নয় ও কেবল বস্তুতান্ত্রিক দ্বান্দ্বিকতার দান নয়। জীবনের একটা শারীরিক ভিত্তিও আছে এবং ইসলাম তা অবহেলা করে না। ইসলাম এ সত্য জানে যে, মানুষকে আত্মিক দিক থেকে মুক্ত করতে হলে, তার দৈহিক মঙ্গলেরও নিশ্চয়তা দিতে হবে।

২. দেহ ও আত্মা বা ইহজগৎ ও পরজগতের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব নেই। আল্লাহ্ এক, তাই সমস্ত অস্তিত্ব এক সূত্রে গাঁথা। মুসলমানকে পরজগতের মঙ্গলের আগে ইহজগতের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। নৈতিক কার্যকারণ এই জগতে বর্তমানকালে

Dhaka University Institutional Repository

যেমন ফল দেয়, তেমনি এ পরজগতেও দিতে থাকবে। কিন্তু সাম্যবাদ (কমিউনিজম্) সৃষ্টি সম্বন্ধে ঐশ্বরিক ব্যাখ্যা অস্বীকার করে এবং মানব ইতিহাস সম্পর্কে এর ব্যাখ্যা, সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুর ব্যাখ্যার মত অনুভূতিশূন্য বস্তুতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

৩. ইসলাম বিশ্বাস করে যে, যখন জাতির মধ্যে দূরদৃষ্টি থাকে না, তখন জাতি ধ্বংস হয়। কুরআনের মতে যতক্ষণ না মানুষের মানসিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিপ্লব আসে, ততক্ষণ প্রকৃত বিপ্লব মানুষের জীবনে ঘটতে পারে না। "আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজে তার নিজের অবস্থা পরিবর্তন করে।"[১২] কুরআন ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ বহু জাতির উদাহরণ দিয়েছে যারা তাদের সংকীর্ণ বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ধ্বংস হয়েছে। নৈতিক নীতির চিরন্তন সত্যে অবিশ্বাস করে তারা হয়েছিল স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী, তাদের নিজেদের সংশোধন করার অনেক সুযোগ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু যখন তারা আল্লাহ্র নির্দেশে কর্ণপাত করলো না। তখন তাদের ধ্বংস হওয়ার দিন আসলো ও তারা অবলুপ্ত হলো। খোদা পাপ-পুণ্যের এক তুলদণ্ড সৃষ্টি করেছেন, এই তুলাদণ্ড এত সূক্ষ্ম ও নির্ভুল যে প্রতিটি পরমাণু এতে মাপা হয় এবং প্রকৃত সময়ে এর ফল দৃষ্টিগোচর হয়। তাই ইতিহাস সম্বন্ধে ইসলামী মত এর আস্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বা সাম্যবাদীরা বস্তুতন্ত্রকে অনুসরণ করে। এই মত কুরআনের মতে সম্পূর্ণ বিপরীদ। সাম্যবাদীরা নৈতিকতার চিরন্তন সত্য অস্বীকার করে। তাদের মতে জগৎ পরিবর্তণশীল এবং জগৎ সম্পর্কিত ধারণাও পরিবর্তনশীল। কাজেই স্থায়ী বা চিরন্তন নৈতিক নিয়ম জগতে থাকতে পারেনা। তাদের মতে সমাজের বস্তুগত ভিত্তি হল অর্থনীতি এবং এই অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে উদ্ভব এবং উপ কাঠামোগত দিক হল নৈতিকতা। বস্তু নৈতিকতার চিরন্তন সত্য অস্বীকার করে। এ মত মানুষকে করে স্বার্থপর, স্বেচ্চাচারী ও অনুভুতি শূন্য, যন্ত্রতুল্ল।

৪. ইসলাম একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক ধর্ম এবং এর প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক একতার দিকে লক্ষ্য করে। আইন ও শৃঙ্খলার খাতিরে বড়দের প্রতি আনুগত্যের কথা বলা আছে, কিন্তু এই আনুগত্যের জন্যে আদেশও সব সময়

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতাপূর্ণ হবে। "পাপে কোন আনুগত্য নেই"- এ হচ্ছে ইসলামের এক মৌলিক নীতি। রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশ ও কার্যবলী সম্পর্কে তুচ্ছতম নাগরিকও সকলের সামনে তাঁকে প্রশ্ন করতে পারে। কিন্তু কমিউনিজমে শাসকদের জবাবদিহিতার দিকটা খুবই দুর্বল। তারা অর্থনৈতিক সাম্যের কথা বললেও সামাজিক সাম্য এখানে অনুপস্থিত। রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি আনুগত এখানে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

৫. ইসলামে আইনের চোখে সকলেরই সম্পূর্ণ সমান অধিকার আছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) নিজেই অন্যদেরকে তাদের প্রতিশোধ ও ক্ষতিপূরণের অধিকার নিজেদেরকেই আদায় করতে বলেছেন, এমনকি তা যদি তাঁর নিজের বিরুদ্ধেও হয়, যদি তিনি অসাবধানতাবশত কোন অন্যায় করে থাকেন।পরাক্রমশালী খলীফা উমর (রা.) এবং বিজ্ঞ ও ধার্মিক আলী (রা.) সাধারণ বিচারালয়ে সুবিচারের জন্য বাদী অথবা বিবাদী হিসাবে হাজির হয়েছেন। কিন্তু কমিউনিজমসহ অন্যান্য শাসন ব্যবস্থায় ইহা চিন্তাও করা যায়।

৬. রাবুবিয়াতের নীতি অনুসারে সকল সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্র, মানুষ তার আমানতদার মাত্র। তাই আল্লাহ্র নামে রাষ্ট্রের সকল সম্পদ প্রয়োজনের ভিত্তিতে সমানুপাতিক হারে বন্টণ করে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করতে হবে। কিন্তু কমিউনিজম ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদের কথা বললেও তাদের মতে তা আল্লাহ্র নামে না হয়ে হবে রাষ্ট্রের নামে। কমিউস্টিরা তথা সাম্যবাদীরা অদৃশ্য ও ভাবমূলক জীবনবোধের ধার ধারে না। তাই তাদের দর্শন মানুষের সামগ্রিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না। আল্লাহ্র নামে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করলে একদিকে যেমন পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসবে অন্যদিকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির একটি যোগসূত্র কায়েম হবে। উল্লেখ্য যে, মানুষ যন্ত্র নয় তার রয়েছে দেহ ও আত্মা। সাম্যবাদী দর্শন কেবল মানুষের জৈবিক তথা দৈহিক দিকের প্রতি গুরুত্ব দেয় কিন্তু আত্মিক দিকটিকে অস্বীকার করে। মানব জীবনে যথার্থ সাম্য তথা শান্তি স্থাপনের জন্য প্রয়োজন দেহ ও আত্মা, বস্তু ও আধ্যাত্মিকতা, ইহকাল ও পরকাল উভয়ের প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ-এ উপলব্ধি বোধ সাম্যবাদীদের মধ্যে অনুপস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

৭. বর্তমান অর্থনীতি মূলত দুটি ধারায় বিভক্ত । এক.ধনতান্ত্রিক ধারা দুই.সমাজতান্ত্রিক ধারা। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধারায় ধন বা সম্পদ উৎপাদন বা ভোগ ও সঞ্চই মূলকথা। ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি কোন নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নেই। এখানে মুনাফা অর্জনই মূল কথা। সে মুনাফা শ্রমিক শোষণ করেই হোক, সমাজকে ঠকিয়েই হোক বা রাষ্ট্রকে ফাঁকি দিয়েই হোক। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধারায় যেহেতু অর্থনীতি ন্যায় সঙ্গত নয়, তাই এখানে উৎপাদনই মূল কথা। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাও একই ধারণা পোষণ করে। সমাজিক অকল্যাণকর দ্রব্য সামগ্রী যেমন-মদ,গাঁজা, ভাঙ্গ, হিরোইন, নীল ছবি ইত্যাদি যতই অকল্যাণকর হোক না কেন তা উৎপাদন,বিক্রয় ও মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন বাঁধা নেই। কারণ ঐ সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর উপযোগীতা আছে। পক্ষান্তরে মানবতার ধর্ম এবং কল্যাণেরধর্ম ইসলামের মূল লক্ষ্য মুনাফা নয় বরং মানব কল্যাণ কাজেই যেসমস্ত দ্রব্য মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ঐ সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন, বিক্রয় এবং ব্যবহার ইসলাম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (হারাম) করেছে; যা মানুষের জন্য এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর নয়, তা ইসলামী অর্থনীতি অনুমোদন করেনা। ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ উৎপাদনের উপাদানগুলিকে ধনিকশ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত হওয়ার সুযোগ করে দেয় এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার উৎপাদন ব্যবস্থার জন্ম দেয়। এর ফলে শ্রমিক শ্রেণীর রক্তে গড়ে ওঠে ধনিক শ্রেণীর সম্পদের পাহাড়। ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণী হয় অবহেলিত ও শোষিত।এ অবহেলা ও শোষণ শ্রমীক শ্রেণীর অন্তরে প্রতিহিংসার জন্ম দেয় এবং শুরু হয় শ্রেণী সংগ্রাম। এশ্রেণী সংগ্রামে জয়ী হয় প্রলেতারিয়েট শ্রেণী।

৮. ধনতন্ত্রে অবাধ ব্যক্তি মালিকানা এবং নীতিবাদহীনতা সম্পদ পুঞ্জীভূত করার দিকে মানুষকে এত বেশী আকর্ষণ করে যে, ধর্ম তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে আসেনা। পুঁজিবাদের নিজস্ব ধর্ম পুঁজি পুঞ্জীভূতকরণ। সে পুঁজি পাপের না পুণ্যের তা বিবেচ্য বিষয় নয়। তাই আয়-বৈষম্যের বিশাল পাহাড় মানবিকতাকে আড়াল করে গ্রাস করে, সৌহার্দ্য ভ্রাতৃত্ব ও মনুষ্যত্বকে। বিশাল অট্টালিকার পাশে তাই জীর্ণ মানুষ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় লাশ হয়ে পড়ে থাকে। ন্যায়বিচার ও সমতার প্রশ্ন সেখানে অবান্তার। পক্ষান্তরে

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ঘোষণা করেঃ "যারা স্বর্ণ-রৌপ্য (সম্পদ) স্তুপীকৃত করে রাখে অথচ মানুষের কল্যাণে তা ব্যয় করেনা, তাদেরকে কঠিন শাস্তির সংবাদ দাও।[১৩]

তাই পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদ ও ব্যক্তি মালিকানার দর্শনের সাথে ইসলামী ব্যক্তি মালিকানার কোন মিল নেই। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিমালিকানা পুঁজি বৃদ্ধি কল্পে শ্রমিক শোষণের নিন্দনীয় ধারণাকে ধারণ করে বলেই এ সময়ের প্রয়োজনে সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। অথচ ইসলামী অর্থনীতি সব সময়ই শ্রমিক অধিকার এবং মালিক ও শ্রমিকের সাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

অসাম্য দূরীকরণ ও শ্রমিক শোষণ-নির্যাতন রোধকল্পে পৃথিবীতে জন্ম দেয়া হয় মাজতন্ত্র বা সমাজবাদ। সম্পদের ব্যক্তি-মালিকানা যেহেতু শ্রমিক শোষণের জন্ম দেয় এবং মানুষের অধিকার খর্ব করে, তাই সমাজতন্ত্র ব্যক্তি-মালিকানাকে বিলোপ করে সম্পদের মালিকানা অর্পণ করে রাষ্ট্রের হাতে। অথচ রাষ্ট্রও যে শোষক হতে পারে, পীড়নকারী হতে পারে, এধারণা সমাজবাদের জন্মদাতাদের ধারণায় ছিলনা। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা হারিয়ে মানুষ হয়ে গেল 'শ্রম দাসে'। পুঁজিবাদে প্রতিবাদের যে সুযোগটুকু মানুষের হাতে ছিল, রাষ্ট্রীয় মালিকানার সমাজবাদে প্রতিবাদের সে সুযোগটুকুও মানুষ হারিয়ে ফেলে। রাষ্ট্র ন্যায়করুক আর অন্যায় করুক তার প্রতিবাদ করা রাষ্ট্রদ্রোহিতা, সুতরাং সাজা মৃত্যুদণ্ড। মানুষকে মুক্তি দিতে গিয়ে তাকে চিরমুক্তি দেয়ার অদ্ভুত ব্যবস্থা। এ যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত 'জুতা আবিষ্কার' কবিতার দু'টি চরণের সাথে তার অপূর্ব মিল।

"কহিল রাজা, এমনি সব গাধা
ধূলারে মারি করিয়া দিল কাদা।"

আসলে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র একই মায়ের দুটি সন্তান। আপতদৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও উভয় তন্ত্রই এক ও অভিন্ন। সাম্য ও সমতার সস্তা বুলি এবং সমাজতন্ত্রের উল্লম্ফন নৃত্য পৃথিবীতে একশত বছরও টিকতে থাকতে পারেনি। বিরাট ধস সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন সৌধকে গুড়িয়ে একাকার করে দিয়েছে। অথচ ইসলাম টিকে আছে স্ব-গৌরবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সকল মুনাফা আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় মুনাফা গ্রহণ করে রাষ্ট্র। অথচ উৎপাদনের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার শ্রমিক সমাজ বঞ্চিত এবং নিপীড়িত হয়–তারা পায়না তাদের ন্যায্য পাওনা। অথচ ইসলাম মুনাফায় শ্রমিকের অংশীদারিত্ব স্বীকার করে নিয়ে শ্রমিক সমাজকে মালিকের মর্যাদায় সমুন্নত করেছে। মহানবী (স.) ঘোষণা করেছেন:"শ্রমিকগণকে তার উৎপাদিত পণ্য থেকে অংশ প্রদান কর। কারণ অল্লাহর বান্দা এই শ্রমিকদেরকে কিছুতেই বঞ্চিত করা যাবেনা।"

অতএব দেখা যায়, মহানবী (স.) এর আদর্শগত শ্রেণীভেদহীন সমাজে মানুষকে সাম্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আর্থনৈতিক যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা আধুনিক বিশ্বের অতি 'সাম্যবাদী' তত্ত্ব মার্কসীয় অর্থনীতিও পারেনি। মুনাফায় শ্রমিকের অংশীদারিত্বের কথা নেই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এবং নেই সমাজবাদী ধারণায়ও।

বস্তুত সাম্যের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় ইসলামে। ইসলাম সাদা-কালো, এশিয়াবাসী-ইউরোপবাসী, আরবী-আজমী এবং ধনী-দরিদ্রে কোন ভেদাভেদ নেই।মানুষ হিসেবে সকলেই সমান।পরম স্রষ্টার আলো-বাতাসে সকলেরই সমান অংশীদার। নামাজের জামাতে এক ঈমামের পিছনে সকলেই সারিবদ্ধভাবে দাড়ায়। ধনীদের জন্য আলাদা কাতারের ব্যবস্থা নেই। খাওয়ার দস্তরখানে, নামাজের জামাতে এবং মেহমানদারীর শিষ্টাচারে ভেদাভেদের কোন সুযোগ ইসলামে নেই। অধীনস্থ শ্রমিক ও দাস-দাসীদের প্রতি সমান ব্যবহার প্রদর্শনের জন্য তাগিত দেয়া হয়েছে নানাভাবে। বলা হয়েছে , "তোমরা যা খাবে তোমাদের অধিনস্থদের তাই খেতে দিবে এবং তোমরা যা পরবে তাদেরকে তাই পরতে দিবে।" এমন সাম্যবাদের কথা কেউ কখনও উচ্চারণ করেছেন বলে শোনা যায়নি। গায়ের ঘাম শুকাবার আগে শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধের কথা ইসলামের নবীর মুখেই উচ্চারিত হয়েছে। উৎপাদনে যারা হাত লাগায়, যারা শ্রমিক, তারা অলস ও নিষ্ক্রিয় বিত্তশালীর তুলনায় হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ। শ্রমিককে মালিকের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, "এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, মর্যাদায় মালিকের তুলনায় শ্রমিকই শ্রেষ্ঠ। এটাও অসম্ভব নয় যে, অধীনস্থ দাসের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়।" সুতরাং শ্রমভেদে মানুষকে স্তরভেদ ইসলাম করেনি। কর্মভেদে মানুষকে ভেদ করা হয়েছে। যে কর্মে শ্রেষ্ঠ, সে-ই শ্রেষ্ঠ মানুষ। সৎকর্মশীল মানুষই মর্যাদাবান মানুষ।

মহানবী (স.) এমন এক সাম্যবাদী সমাজ তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, যে সমাজে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা.)-কে জবাবদিহি করতে হয় যুবকের কাছে যে, তিনি বায়তুল মাল থেকে কি দু'টুকরা কাপড় নিয়ে জামা তৈরি করেছেন ? যেখানে অন্যরা মাত্র এক টুকরা করে কাপড় পেয়েছে । খলীফা পুত্র পিতার পক্ষ থেকে জবাব দেন যে, আমার টুকরাটি আমি বাবাকে দান করেছি বলেই বাবা জামা তৈরি করতেসক্ষম হয়েছেন। মুসলিম জাহানের খলীফা হয়েও এক টুকরা বেশী কাপড় নেয়ার ক্ষমতা তার নেই।

ইসলাম এমন এক সাম্যেরবানী প্রচার করে যেখানে রাতের আধারে পিঠে বয়ে আটার বস্তা গরীবের ঘরে পৌছে দিতে হয় স্বয়ং খলীফাকে, যেখানে নবী-তনয়া হয়েও সংসারের সমস্ত কাজ করতে হয় বিবি ফাতিমাকে, যেখানে কুয়োর পানি তোলার শ্রম দিয়ে আহার্য সংগ্রহ করতে হয় বিশ্ব মুসলিমের সর্দার হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে। নবীজি বলেছেন, নেতা বলে বড় নই, সেনাপতি বলে বড় নই, নবী বলেও বড় নই। আমি তোমাদের মতই মানুষ।

কাজেই সাম্য ও সমতার বাণী শুধু প্রচার নয়, কার্যক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে রাবুবিয়াত দর্শনের প্রবর্তক মোহাম্মদ (স.) সাম্য-সমতা প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্ববাসীর কাছে যে মডেল বা ছাঁচ রেখে গেছেন, সে মডেল অনুসরণ করার মাধ্যমেই পৃথিবী সাম্য সমতার অনিন্দ্য ভুবনে প্রবেশ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ ২০০৭. পৃ. ৪৮-৪৯

২. Engels, *Anti-Duhring,* Peking : Foreign Languages press, 1976. p. 72

৩. জোসেফ স্ট্যালিন, *দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ*, ঢাকা : ১৯৮৩. পৃ. ৩

৪. মরিস কর্ণফোর্থ, *দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ*, অনুবাদ- ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : ১৯৮৭. পৃ. ১২

৫. হারুন রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৬. দ্রষ্টব্য, মার্কস, *গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা*, রচনা- সংকলন

৭. হারুন রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

৮. ঐ

৯. মার্কস, 'হেগেলের আইনের দর্শনের পর্যালোচনায় প্রদত্ত রচনা', (ভূমিকা) ধর্ম প্রসঙ্গে. পৃ. ৪০

১০. হারুন রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

১১. ঐ

১২. *আল-কুরআন*, ১৩:১১

১৩. *আল-কুরআন*, ৪:৩৪

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উপসংহারে আমরা রাবুবিয়াত দর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন অধ্যায়ে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে এর একটি নির্যাস উপস্থাপনের চেষ্টা করবো।

ইসলামের মূলনীতি তাওহীদ। এর পর-পরই যে দ্বিতীয় মূলনীতিটি পাই তা হচ্ছে খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব। সৃষ্টি বা কর্ম স্রষ্টা বা কর্তার ইচ্ছা, ক্ষমতা ও জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে। সৃষ্টিসমূহের মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বা প্রতিনিধি। সমগ্র সৃষ্টিই মানুষের কাছে অবনত। মানুষের ভেতর এমন সব প্রতিভা, শক্তি ও সম্ভাবনা রয়েছে যা অন্য কোন সৃষ্টির মাঝে নেই। রাব্বুল আলামীনের যত রাব্বানী গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার সবই সন্নিবেশিত রয়েছে মানুষের মাঝে। অর্থাৎ 'রাবের' রাবুবিয়াত বা লালন-পালন, পরিচর্যা ও সৃষ্টি ধর্ম গুণ-বৈশিষ্ট্য মানুষকে যে রকম মহাসমারোহে ও সীমাহীনভাবে দেওয়া হয়েছে তা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। তাই ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানুষ সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের যোগ্যতম ও পূর্ণাঙ্গতম খলিফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহ্ মানুষকে সর্বাধিক সম্মানে ভূষিত করেছেন। বিশ্বজগতে এমন কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য-ও উপকরণ নেই যা মানুষের ভেতর নেই। এ কারণেই মুসলিম দার্শনিকগণ বলেন, মানুষকে 'ক্ষুদে বিশ্ব' বা আল-আলাস আল-আসগার (Microcosm) আর সৃষ্টিকে মহাবিশ্ব বা আল-আলাস আল-আকবার (Macrocosm) নামে অভিহিত করেছেন। এ মানুষের ভেতর বস্তুগত সার্বিক উপাদান উপকরণ দেয়া ছাড়াও স্রষ্টা নিজ থেকে এমন বৈশিষ্ট্য বা সত্তাগুণ (রুহ) দান করেছেন যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। এ কারণেও মানুষ শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি,আশরাফুল মাখলুকাত। কাজেই মানুষের উচিত নৈতিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিকাশ ঘটিয়ে তার খিলাফতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানুষের সকল কাজই আল্লাহ্র ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইবাদতের আংশিক জড়িত স্রষ্টার সাথে(হাক্কুল্লাহ্) এবং আংশিক জড়িত মানুষের সাথে(হাক্কুল ইবাদ)। 'রাবুবিয়াত দর্শন' উভয় প্রকার ইবাদতের প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ

Dhaka University Institutional Repository

করে। এ দর্শন অনুসারে বান্দার হক উপেক্ষা করে শুধু আল্লাহ্‌র ইবাদত করলে সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- ব্যক্তিগত মানবিক প্রয়োজন, পরিবার, সংসার ও জাগতিক সকল কিছু উপেক্ষা করে কেউ যদি শুধু আল্লাহ্‌র ধ্যানে ও চিন্তায় জীবন পরিচালনা করে সিদ্ধি লাভ করতে সচেষ্ট হয় , তাহলে তা হবে নিষ্ফলপ্রচেষ্টা। তাইতো কুরআনে উল্লেখ রয়েছে: "তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে ও কেনো কিছুকে তাঁর শরীক করবেনা এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী, এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসিদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে (৪:৩৬)।"

ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মানবজাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা। রাবুবিয়াতের নীতি অনুসারে স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে সকল মানুষ সমান। জন্ম বা মর্যাদার কারণে মানুষে মানুষে কোন প্রকার ভেদ নেই। ধর্ম, জাতি এবং দেশ বিভিন্ন হলেও সকল মানুষ মূলতঃ এক পরিবারভুক্ত, সকলের উৎস এক। আল কুরআনে ঘোষিত হয়েছে : "সমস্ত মানব মণ্ডলী একজাতি" (২:২১৩)। "হে মানুষ, আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে ; যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদিগের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদিগের মধ্যে অধিক মুত্তাকী" (৪৯:১৩)। কাজেই মানুষের উচিত জন্ম, বংশ ও মর্যাদাগত সকল ভোদা-ভেদ ভুলে একে অন্যের রোগে-শোকে, সুখে-দুখে, বিপদে-আপদে এগিয়ে এসে মানব জাতির মধ্যে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করা।

'রাবুবিয়াত দর্শন' মানুষকে সৃষ্টির সেবায় উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তার বদান্যতা, মহানুভবতা, দানশীলতা, পরোপকার প্রভৃতি মানবিক গুণের উপর। পবিত্র কুরআন-হাদীসে যেখানেই ইবাদগত সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় সর্বত্রই আল্লাহ্‌ ইবাদতের সাথে সাথে সৃষ্টির সেবাকেও শামিল করা হয়েছে : "সুতরাং দুর্ভাগ্য সেই সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক

Dhaka University Institutional Repository

দেখানোর জন্য তা করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে।" (১০৭:৪-৭)। "তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাদের যে রিজিক দান করেছি উহা হতে তারা ব্যয় করে" (৩২:১৬)। আল-কুরআনের উপরোক্ত আয়াত দুটিও সুস্পষ্টভাবে ইবাদতের সাথে সৃষ্টির সেবায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য দানের মহিমার কথা বলা হয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও মমত্ববোধের উৎসও এখানে সুস্পষ্ট।

রাব্বানী দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে শেখায়। ইসলামী চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মানুষের সাথে হাসি মুখে কথা বলা ; তথা মন খুলে মেলামেশা করা। মহানবী (স.) বলেছেন : 'যার হাতে আমার জান তাঁর শপথ, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমরা মুমিন হবে; আর তোমরা মুমিন হবে না যে পর্যন্ত তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে।' 'মানুষের জন্য তা ভালোবাসবে, যা নিজের জন্য ভালোবাস, তবে তুমি মুসলিম হবে।' 'সেই লোকদের মধ্যে ভালো যে লোকের উপকার করে।' বস্তুত, মানুষ যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মত অনুসারে পরস্পরকে ভালোবাসতে শেখে তাহলে বর্তমান পৃথিবীতে অত্যাচার-অবিচার, হত্যা ও ধ্বংস চলছে তা পৃথিবী থেকে দূরীভূত হয়ে ইহা শান্তি ময় আবাসে পরিণত হবে।

'রাবুবিয়াত' মানবসাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ঐশী উৎসের দিক থেকে সকল আত্মা পরমসত্তা বা আল্লাহ্ এর নিকট থেকে এসেছে এবং তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব, নিজে বড় ভেবে অহংকার করা আর অন্যকে ছোট ভেবে হেয় করার কোন অবকাশ নেই, মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই।

এজন্য মহানবী (স.) বলেছেন: 'কোন আরব কোন অনারবের চেয়ে শ্রেষ্ট নয় এবং কোন অনারব কোন আরবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়; কোন সাদা কোন কালোর চেয়ে এবং কোন কালো কোন সাদার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। আমরা সবাই আদম সন্তান।' ইসলামী মতে, মানুষের মর্যাদা তার অর্জিত গুণ বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য ক্ষমতা বা সম্পদের উপর নির্ভর করেনা;

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভর করে তার নিজ চারিত্রিক গুণ ও সমাজের উপকারার্থে তার অবদানের উপর। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সামনে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যিনি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধর্ম পরায়ণ" (৪৯:১৩)।

ইসলামী মতে, আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাদের সকলের মালিক আল্লাহ্‌ তা'আলা–মানুষ নয়। রাব্বানী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মানব জীবন শোষণ এবং শাসনের জন্য নয়-পালনের জন্য। কাজেই 'রাব' গুণের প্রতিভূ হিসেবেই মানুষ সম্পদ অধিকার করবে, মালিক রূপে নয়। অর্থাৎ অপরের কল্যাণে অন্তরায় বা উদাসীন না হয়ে বরং নিজের কল্যাণের সাথে সাথে অপরের কল্যাণের কথা চিন্তা করে ইসলাম সম্পদ ভোগের কথা বলে। অন্যদিকে সম্পদ মজুদ ও জমা করাকে ইসলাম কঠোর ভাবে নিন্দা করে, সম্পদের সুসম বন্টণের কথা বলে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেঃ "তারা অভিশপ্ত, যারা ধন মজুদ করে আর গুণে গুণে রাখে। আর ভাবে, তাদের ধন তাদের নিরাপত্তা দিবে। এই সম্পদ তাদের এমন অবস্থায় টেনে নিয়ে যাবে যা তাদের টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলবে।" আল্লামা ইকবাল মানবজাতিকে প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপনের শিক্ষা দিয়েছেন; আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রকৃতির রহস্যরাজির দ্বারা উন্মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু এ প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদ কেবল পার্থিব উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নয়। কোন ব্যক্তি বা জাতির ক্ষতি সাধনের জন্য নয়, বরং তা কেবল মানবকল্যাণের জন্য, আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য। 'মরদে মুমিন' আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্যই দুনিয়ার সব কাজ করে থাকে। সে আপন জীবন-মরণ আল্লাহর জন্যই উৎসর্গ করে। প্রত্যেক কাজের মধ্যদিয়ে সে আপন স্রষ্টার মহিমা বিস্তার করে।আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের ডাকেই সে প্রকৃতির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এখানেই মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য। আল্লাহ্‌ তা'আলা তার কুরআনে আমাদেরকে এ কথাগুলো বলার শিক্ষা দিয়েছেন: "ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।"(৬:১৬২) অর্থাৎ-বল, 'আমার সালাত,আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে।'

Dhaka University Institutional Repository

রাব্বানী দর্শন মনে করে মানবের প্রতি অত্যাচার , অবিচার, দরিদ্রের প্রতি নির্মম ব্যবহার, প্রজার রক্ত শোষণ এবং স্ত্রী-পুত্রকে ভরণ-পোষণে বঞ্চিত রেখে কেবল আল্লাহ্ আল্লাহ্ বললে মুক্তি মিলে না।

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, তৃষ্ণার্তকে পানি দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, পীড়িতকে সেবা শুশ্রুষার মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায়। মানুষকে দৃষ্টিশক্তি দেওয়া হয়েছে, কথা বলার শক্তি দেওয়া হয়েছে, শুভ-অশুভ দুটি পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যাতে সে দায়িত্বে কঠিন পথ পরিক্রমায় উত্তীর্ণ হয়। দায়িত্বের সে কঠিন পথ পক্রিমা হচ্ছে-দাসমুক্তকরণ, অভাব অনটনে জর্জরিত নিরন্ন ও নিঃসহায়দের খাদ্য দান তথা অভাব দূরীকরণ এবং ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা এবং পরোপকারে ব্রতী হওয়া। এজন্যই কুরআনে বলা হয়েছেঃ "পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নাই। কিন্তু পূণ্য আছে ... আল্লাহ্ প্রেমে, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক এবং সাহায্য প্রার্থীদিগকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য্য ধারণ করলে। রাবুবিয়াত দর্শন আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, যেহেতু রাহীম রাহমতের সাথে কর্মফল দান করেন সেহেতু দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য শ্রমের পূর্ণ মর্যাদা দান করা। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন : "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিবে।" শ্রমের অমর্যাদা এবং শ্রমিকের বহুবিধ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে, তার শ্রম অপহরণই দেশে দেশে অসংখ্য নর-নারীর দুঃখ কষ্টের কারণ। তাই রাহীম যে গুণের প্রতীক বিশ্বমানব যে দিন সেগুণের অধিকারী হবে, 'রণক্লান্ত' মানব সেদিন শান্ত হবে এবং সেদিন আর :

"অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবেনা;
উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।"

বস্তুত, যতদিন ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে, নেওয়া-দেওয়ার ব্যাপারে রাহমান ও রাহীমের নীতি সক্রিয়ভাবে অনুসৃত না হবে, ততদিন বিশ্ববাসীর নিকট শান্তির লালিত বাণী ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, রাবুবিয়াত দর্শন আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, মানুষের ধন-সম্পদকে নিজের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে কাজে লাগাবে কিন্তু ইহার দাসে পরিণত হবে না; ধন-সম্পদ মানুষকে চালাবে না, বরং মানুষই ধন-সম্পদকে চালাবে ও কাজে লাগাবে। আশরাফুল মাখলুকাত বা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ স্বীয় 'রাবের' প্রতি অনুগত ও বাধ্যগত থাকবে এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলকে স্বীয় 'রাব' এর কর্ম, কীর্তি, দান ও নেয়ামত হিসেবে লালন-পালন, সংরক্ষণ, সম্মান ও সমৃদ্ধ করবে। প্রতিটি মানুষকেই 'রাব' স্বীয় বিশেষ বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু অধিক মানুষই রাবুবিয়াতের জ্ঞানের অভাবে এই বিষয়টি জানে না। তবে যারা জানে তাদের কর্তব্য হল নিজেদের ভেতর যত বেশি সম্ভব রাব্বুল-আলামীনের গুণ-বৈশিষ্ট্য চর্চা ও বিকশিত করা; এতে নিজেও সে উপকৃত হবে, সৃষ্টিকুলও উপকৃত হবে। কাজেই রাবুবিয়াত দর্শন যত বেশি ও যত দ্রুত মানুষের মাঝে চর্চিত হবে তত দ্রুত পুঁজিবাদী শোষণ-শাসন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় অন্যায়-অবিচার, গোড়ামী, কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অনৈতিকতা এবং দুর্নীতি জগৎ থেকে বিদায় নিবে এবং বিশ্ব নিশ্চিত সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখতে পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. মৌলিক উৎস

The Glorious Koran, trans, Pickthall, M., London: George Allen & Unwin Ltd., 5th ed., 1969

The Holy Qur'an, trans. & Commentary, 2 vols, Ali, Abdullah Yusuf, Lahore, 1938

কুরআন শরীফ, বঙ্গানুবাদ, ড: মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, আরবীর বাংলা উচ্চারণ, হযরত মাওলানা মফিজ উল্লাহ, চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা-২০০১।

Imam Bukhari, *Sahih Al-Bukhar,* 9 vols., Muhammad Muhsin Khan, Kitab Bhavan, 1984

Imam Muslim, *Sahih Muslim,* trans. Abdul Hamid Siddiqi, 4 vols., Lahore, Reprint 1987

ইমাম বুখারী, *বুখারী শরীফ*, ১০ খন্ড, সিহাহ্ সিত্তাহ্ প্রকল্প, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Abul Hashim, *The Creed of Islam*, Dhaka : 3rd Ed. Islamic Foundation Bangladesh: 1980

......................., *As I See it*, Dhaka : Islamic Academy, 1995

......................., *রব্বানী দৃষ্টিতে*, ঢাকা : আবুজর গিফারী সোসাইটি, (সন উল্লেখ নাই)

......................., *ইসলামের মর্মকথা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১

আল্লামা আযাদ সুবহানী, *বিপ্লবী নবী*, অনুবাদ মওলানা মুজিবুর রহমান, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে*, ঢাকা : ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৮০

......................., *জীবন দর্শনের পুনর্গঠন*, চট্টগ্রাম ও ঢাকা : ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৮০

......................., *ইসলাম ও মানবতাবাদ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বংলাদেশ, ১৯৮০

......................., *জীবন দর্শনের পুনর্গঠন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০

......................., ধর্ম ও *দর্শন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮০

......................., অতীত জীবনের স্মৃতি, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৭

......................., *দর্শনের নানা প্রসঙ্গ*, ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৭

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, *রাবুবিয়াতের ভূমিকা*, হুকুমাতে রাব্বানীয়া সমিতি প্রকাশনী, সন্তোষ, বাংলাদেশ, ১৯৭৪

......................., ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : *দর্শন ও কর্ম*, সৈয়দ [illegible] সংকলিত ই: বি: প্রকাশনা সিরিজ, সন্তোষ, ১৯৭৮

......................., মাও সে তুঙের দেশে, সৈয়দ আবুল মকসুদ, মাওলান আবদুল হামিদ খান ভাসানী (পরিশিষ্ট)

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪,

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, *মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী*, ঢাকা : ঝিনুক প্রকাশনী, ২০০৪

শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত, *মাওলানা ভাসানী, রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৮

২. গৌন উৎস

Affifi, A.E., *The mystical Philosophy of Mohiuddin Ibnul Arabi,* England, Cambridge University press

Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam,* New Delhi: S. Chand and Co., 1950

Dr. Sm Yusuf, *Hazrat Abu Dharr al- Gifari*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1st Ed. 1969

Enamul Haq, Mohammad, *A history of Sufism in Bangal,* Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1975

Ghazali Imam, *Tahafut al Falasifa,* Trans., Kemali, S.A., Lahore: Pakistan Philosophical Congress

Iqbal, A.M., *The Reconstruction of Religious Thought in Islam,* (5th ed), New Delhi: Kitab Bhavan, 1994

Mohammad Hashim Kamali, *Freedom Equality and Justice in Islam,* Malaysia, Ilmiah Publishers: 2002

Majid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy,* (2nd ed.), Columbia University Press, New York, 1983

Saiyed Abdul Hai, *Muslim Philosophy,* Islamic Foundation Bangladesh, 1982

Saiyid Athar Rizvi, *A History of Sufism in India,* Munshiram Manoharlal publishers pvt. ltd., New Delhi, 1978

Smith, J.E., (ed.), *Philosophy of Religion,* New York: the Macmillan Company, 1965

T.W. Arnold, *The Preaching of Islam,* kashmiri bazaar, Lahore, SH. Muhammad Ashraf: 1965

The Encyclopedia of Islam Leiden : E. J. Brill, 1989, vol.

W.A. Friendlander, *Introduction of social Welfare,* New Delhi: 5th edn. 1963

আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা; নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৯৬

....., *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা; মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০

....., *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪

আবদুর রহমান, *কোরআন ও জীবন দর্শন*, ১ম ও ২য় খণ্ড, চট্টগ্রাম: রহমানস পাবলিকেশনস, ১৯৬৩

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, *আল কুরআনের শিক্ষা*, অনু: মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯

আবু সাইদ মুহাম্মদ ওমর আলী (সম্পা), *সীরাত স্মরণিকা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ.১০৫

আবু জাফর শামসুদ্দিন, *দৈনিক সংবাদ* , ২২নভেম্বর, ১৯৭৬

আনিসুজ্জামান মানিক, *মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবনদর্শন*,'দর্শন ও প্রগতি'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা : জুন-ডিসেম্বর ২০০৫

আবু জাফর শামসুদ্দিন, *দৈনিক সংবাদ*, ২২ নভেম্বর, ১৯৭৬

আলী হায়দার, *জার্নাল আব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ২০১০.

আদীল মুহাম্মদ, আব্বাস কাজী, *তাহবীক -এ খিলাফত*, নতুন দিল্লী: উর্দু রোড, ১৯৭৭.

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, বাংলার খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন, ঢাকা: বাংলা একাডেমী

আবদুল আলী, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, ফরিদপুর, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র: ১৯৮০

আনিসুজ্জামান, *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : একজন জীবন ঘনিষ্ঠ দার্শনিকের প্রতিকৃতি*, 'বিশ্বদর্শন দিবস বিশেষ সংকলন', দর্শন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়. ঢাকা ; ২০০৮

আশরাফ আলী থানভী, *হায়াতুল মুসলিমীন*, অনু: মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী: ১৯৯৫

ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা, *সাহাবীদের বিপ্লবী জীবণ*, অনু: মো: আবদুল মোনয়েম, ঢাকা: আদ দা'ওয়াহ গ্রন্থানুবাদ ও গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৩.

ইমাম গাযালী, *সৌভাগ্যের পরশমনি*, ৪ খণ্ড, অনুবাদ, আবদুল খালেক, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৩৮

ইসমাইল হোসেন সিরাজী, *হাকীকতে তাওহীদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯৫

ইমাম আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইব্ন শারফ আন-নববী আদ-দিমাশকী, *রিয়াদুস সালেহীন*, (আরবী) রিয়াদ, দারুস সালাম: ১৯৯৯

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১-২৫ খণ্ড, ঢাকা: ১৯৮৫

....., *ইসলামী দর্শন*, (সংকলন) ঢাকা: ২০০৪.

....., *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্ব কোষ*, তৃতীয় মূদ্রণ, ঢাকা: ১৯৯৫

.....,*মুসলিম মনীষা*, (সংকলন), ঢাকা : ২০০১

খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ, *সৃষ্টি তত্ত্ব*, দ্বিতীয় সংকলন, ১৯৬৩

খলীফা আবদুল হাকীম, *ইসলামী ভাবধারা*, (২য় সংস্করণ) অনুবাদ, সাইয়েদ আবদুল হাই, ঢাকা : ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৭

জোসেফ স্ট্যালিন, *দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ*, ঢাকা : ১৯৮৩

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ এনামুল হক, *মুহাম্মদ এনামূল হক রচনাবলী* (সম্পা.)মনসুর মুসা, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯১

ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ,* অনুঃ আবদুল মতীন জালালাবাদী, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩

গোলাম মোহাম্মদ পারভেজ, *ইসলামিক রাষ্ট্র প্রধানের অর্থনৈতিক দায়িত্ব,* অনুঃ আবদুল আউয়াল, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০

দৌলতুন্নেছাখাতুন, *সমাজসেবার মূলনীতি ও মূল্যবোধ,* ঢাকা, ১৯৬৫

দৈনিক সংবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

নুরুল ইসলাম মানিক (সম্পাঃ), *ইসলামী দর্শনের রূপরেখা,* দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামের শ্রমিকের অধিকার,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪

.........................., *ইসলামের অর্থনীতি দর্শন ও হযরত আবুযর গিফারী রা.,* ফরিদপুরঃ ইসলামিক ফান্ডেশন বাংলাদেশ, ইসলামী সংস্কৃতিক কেন্দ্র ১৯৮২

বাংলা একাডেমী, আবুল হাশিম, ঢাকাঃ

শেখ ফজলুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে,* ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২

মাওলানা হিফযুর রহমান, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা,* অনুঃ মাওলানা আবদুল আউয়াল, ঢাকাঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি,* ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনীঃ ১৯৯৭

শেখ মাহমুদ আহমদ, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা,* অনুঃ গুলশান মুহাম্মদ আবদুল হাই, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , ১৯৮০

মুহিউদ্দীন, *বিপ্লবীসাহাবী আবুযর গিফারী (রা.)* ঢাকাঃ কাওসার পাবলিকেসান্স লিঃ, ১৯৭৮

মুহাম্মদ আব্দুল গফুর (সম্পাদিত) *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭.

মুফতী মুহাম্মদ শফী, *ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ বন্টন,* ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৩

মুফতি মুহাম্মদ শফী, *ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫

মার্কস, *গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা,* রচনা সংকলন

মোঃ রফিকুল ইসলাম, *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ,* ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০২,

মোঃ আতিকুর রহমান, *সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন,* ঢাকাঃ কুরআন মহল, ২০০১

মুফতী মুহাম্মদ শফী, *আত্মশুদ্ধি,* অনুঃ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমানখান, মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকাঃ ১৯৯৯

মুহাম্মদ আবদুল খালেক, *ইসলামী অর্থনীতি,* ঢাকা, আরাফাত পাবলিকেশন্সঃ ১৯৯৫

সাইয়েদ আবদুল হাই, *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ,* ২য় খণ্ড, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬

সাইয়োদ আবুল আ'লা মওদুদী, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান,* অনুঃ আবদুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য, ঢাকা, শতাব্দী প্রকাশনীঃ ২০০৪ঃ

Dhaka University Institutional Repository

....., *কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা*, অনু: গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৫.

....., *তাফহীমুল কুরআন*, অনু: মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০২

সালাহউদ্দীন, *মৌলিক মানবাধিকার*, অনু: মুহাম্মদ আব্দুল বাশার আখন্দ, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ: ২০০৪

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, *ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার*, অনু: কারামত আলী নিজামী, ঢাকা, শিরীন পাবলিকেশন্স: ১৩৯৪ বাং.

সাইয়েদ মানাজির আহসান গিলানী, *হযরত আবুযর গিফারী রা.* অনু. এ বি এম কামাল উদ্দিন শামীম, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭

সৈয়দ মুজতবা রিজা আহমদ *'আল্লামা আযাদ সুবহানী:কর্ম ও জীবন দর্শন*, ঢাকা,২০০১

সানাউল্লাহ নূরী, *চল্লিশ দশকের রাজনীতি ও ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ঐতিহ্য*, ১ম বর্ষ, ফাল্গুন ১৯৯২

সোহেলা সোবহান, *মানবতাবাদী দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ*, 'বাংলাদেশ দর্শন সমিতির পত্রিকা', ঢাকা : জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৬

হাসান আজিজুল হক (সম্পাদিত), *গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮৯.